চিরসীমন্তিনী

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন ১৩৬৮

—দশ টাকা—

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩
হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও দি শ্রীধর প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ১৭ ভীম
ঘোষ লেন, কলিকাতা ৬ হইতে জি. সি. পান কর্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

সাহিত্যিক ও সাহিত্য-ঐতিহাসিক

শ্রীমান স্মুজিতকুমার সেনগুপ্তের

করকমলে—

এ কাহিনী কল্পিত উপন্যাস, রামায়ণের অনুসরণ নয়। তবে তখনকার দিনে ঐ অঞ্চলে যে সমাজ-ব্যবস্থার চিত্র রামায়ণে পাওয়া যায়—আমি তাকে লঙ্ঘন করেছি বলে মনে করি না। বিবাহবন্ধন তখনও ওখানে প্রচলিত হয় নি, 'ভার্যা', 'স্ত্রী', 'পতি' এসব শব্দ আর্যদের রীতি অনুসারেই ব্যবহৃত হয়েছে; কারণ দেখা যাচ্ছে, বালী নির্দ্বিধায় রুমাকে সম্ভোগ করছেন, অপরপক্ষে সে রুমাকে পুনর্গ্রহণ করতে সুগ্রীবের কোন আপত্তি দেখা দেয় নি—বরং আগ্রহই দেখা গেছে। আবার অতি সহজেই তিনি তারাকে নিয়ে বসবাস করতে লাগলেন—সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন বা কৈফিয়ৎ কোথাও নেই। রামায়ণকারও স্বাভাবিক ভাবেই ব্যাপারটা গ্রহণ করেছেন।

কিষ্কিন্ধ্যাবাসীদের সত্যসত্যই আমাদের পরিচিত স-লাঙ্গুল শাখামৃগ মনে করার কোন কারণ নেই। দেখা যাচ্ছে, তাঁরা বস্ত্র পরিধান করতেন, পুষ্পমাল্য স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। প্রসাধন বস্তু অন্যান্য গন্ধদ্রব্য ব্যবহৃত হ'ত। মহার্ঘ্য শিবিকা, সুকোমল শয্যারও অতি মনোহর বর্ণনা আছে। এগুলি আর যাই হোক, লাঙ্গুলধারী বানরের ভোগ্য নয়।

—লেখক

চিরসীমন্তিনী

॥ এক ॥

অবশেষে সত্যিই এক সময় সীমন্তিনী তারা স্বুবর্ণ দর্পণ সরিয়ে রেখে, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন।

দীর্ঘ সময় লাগে তাঁর প্রতিদিনই, অপরাহ্নের এই প্রসাধন বা রূপসজ্জায়। তিন দণ্ডের কমে হয় না কোনদিন, আজ বোধহয় কিছু বেশীই লেগেছে। অনেকবারই মনে হয়েছে, এতক্ষণে ক্রুটিহীন হল—কবরী বিন্যাস সমাপ্ত, ললাটের চূর্ণ কুন্তলগুলি স্বেদবিন্দুর অনুকল্প হিসাবে স্বুশোধিত চন্দন তৈল প্রয়োগে পরিচ্ছন্ন ললাটে লিপ্ত করা হয়েছে—সযত্নে অবিন্যস্তভাবে স্ববিন্যস্ত করা, যাতে বাতাসে না সেগুলিকে স্থানচ্যুত করতে পারে, মুখের চিত্র না বদলে যায়; কদম্ব কেশরের সঙ্গে কেতকীর রেণু মিশ্রিত ক'রে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণকে গৌর না হোক, উজ্জ্বলতর করতেও দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়; সে ঔজ্জ্বল্য যে স্বাভাবিক নয়, তাঁর চর্ম-বর্ণ যে এতটা স্বুগৌর নয়—তা কেউ না বুঝতে পারে, সেই জন্যই এত যত্ন নিতে হয়।

ঠিক এইভাবেই কঙ্কন কেয়ূর মণিহার সীমন্তচন্দ্রিকা নির্বাচনে বিলম্ব হয়ে যায়। কোন্‌টার সঙ্গে কোন্‌টা ঠিক শোভন হয়—এ তিনি যেন কিছুতেই স্থির করতে পারেন না, কোন পারিপাট্যই শেষ অবধি তাঁর মনঃপূত হয় না। সেই জন্যই দর্পণ ও প্রস্তর-নির্মিত প্রসাধনপেটিকা—তার মধ্যে প্রস্তরপুটে রূপসজ্জার অসংখ্য উপকরণ—বারবার সরিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন, বারবারই সেগুলিকে আবার কাছে টেনে নিতে হয়েছে।

অথচ এর যে কোন প্রয়োজন নেই—তা তারাদেবী জানেন।

কিষ্কিন্ধ্যার পট্টমহাদেবী—এ বিশেষণ উত্তরাখণ্ডের সভ্যতাগর্বী আর্যরা ব্যবহার করে তিনি শুনেছেন, এদেশে তাঁকে 'বড়রানী' বলেই অভিহিত করা হয়; কিন্তু তিনি চান আর্যদের ব্যবহৃত বিশেষণেই

পরিচিত হতে, মনে হয়, শব্দটা ঢের বেশী মর্যাদাব্যঞ্জক—যে সুন্দরী, তা তিনি নিজেও যেমন জানেন, বহু দূর দূর দেশের লোকও জানে। তাঁর রূপের খ্যাতি বহু বিস্তৃত, এ সংবাদ তিনি নিঃসন্দিগ্ধ নিশ্চিতভাবে জেনেছেন। শুধু এইজন্যই বহু অর্থব্যয়ে বিশ্বস্ত চর প্রেরণ করেছেন দেশ-দেশান্তরে।

উত্তরাখণ্ডের আর্যরা হয়ত তা স্বীকার করবে না। তাঁরা ওঁদের বলে অনার্য, বর্বর। এমন কি পশু, দানব, দৈত্য, রাক্ষস প্রভৃতি অভিধায় বিশেষিত করে। ওঁরাই তো আমাদের কাছে বানর নামে পরিচিত। অথচ তাঁদের যতই উজ্জ্বল গৌরকান্তির গৌরব থাক—এমন নমনীয়তা, এমন সুচারু গঠন, এমন কোমল দেহভঙ্গিমা ওখানের কোন নারীই দাবী করতে পারবে না।

তারাদেবী শুধু চর নয়, সেই সঙ্গে বিশিষ্ট কুশলী শিল্পীও প্রেরণ করেছেন। তারা বহু রাজ্যের প্রধান-অপ্রধান মহিষীদের পট এঁকে এনেছে। কোশল, মগধ, কাশী, মৎস্য, মদ্র—এমন কি গান্ধার দেশেও এইসব দক্ষ পটুয়ারা গেছে, তারা শুধু মহিষী নয়—নটী, বারাঙ্গনা, সাধারণ নাগরিকাদেরও চিত্র এঁকে এনেছে। সে মেয়েগুলিও সুন্দরী, কিন্তু উনি বা—এমন কি ওঁর সপত্নী বা জাতা—(কি বলবেন, তা আজও তিনি জানেন না) রুমাও কোন অংশে তাদের চেয়ে কম সুরূপা নন। বরং মনে হয় পেলবতায়, মাধুর্যে, গঠনে, চলনে, গ্রীবাভঙ্গীতে তাদের চেয়ে অনেক বেশী কাম্য, অনেক বেশী বাঞ্ছিত।

ওদের মতে যারা নিতান্ত অনার্য-কন্যা, পশুর সমান, তাদের নৃত্য দেখলে ঐ সভ্যতাগর্বী অসভ্যগুলো বুঝত নৃত্য কাকে বলে; মনে হত, এদের দেহে অস্থি বলে কোন পদার্থ নেই, শুধু সুকোমল মাংস, নবনী দিয়া গড়া। তাও ঐ সব ঘৃত ও মাংসখাদিকাদের মতো বসাবহুল মেদ নয়, তন্বী, ভঙ্গুর, পুষ্পদণ্ডের মতো সন্নত, পুষ্পের মতোই কোমল ও সদা-নবীন।

এই সবই জানেন, বিশ্বাস করেন, তবে এ সযত্ন প্রসাধন কেন ?

কে জানে, তারা বোধ করি নিজেও জানেন না।

বোধ করি সেই অ-দৃষ্ট, বহু দরবস্ত আর্যনারীদের সঙ্গে স্পর্ধিত প্রতিযোগিতার জন্যই। তাদেরও প্রসাধন সামগ্রী আছে, তারাও এসব এবং অন্যান্য, ওঁদের কাছে দুর্লভ বস্তু দিয়ে রূপসজ্জা করে—কিন্তু তব, তারাদেবী নিশ্চিতভাবেই বলতে পারেন, এমন অত্যাশ্চর্য সজ্জা, সে সব বিদ্যা ও রূপ-গরবিনীরা জানে না।

তারাদেবী প্রসাধন বেদিকা ত্যাগ ক'রে ইঙ্গিতে প্রধানা সহচরীকে এগুলি যথাস্থানে তুলে রাখতে বলে, তাঁর প্রাসাদাংশ সংলগ্ন মুক্ত অলিন্দে এসে দাঁড়ালেন। এখান থেকে ঋষ্যমূক দুর্গচূড়া দৃষ্টিগোচর হয়, এই জন্যই এ স্থানটি এত প্রিয় তাঁর। যদিচ ঐ দুর্গ চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিনই একটা তীব্র অন্তর্জ্বালা বোধ করেন, সে দাহ দৈহিক দুষ্ট ক্ষতের মতোই অসহ্য বোধ হয়—তবু এখানে না এসেও পারেন না।

ঐখানে এমন একটি মানুষ আছে, যে ওঁর এই রূপসজ্জার মর্ম বা মূল্য বুঝত, যে ওঁর রূপের চিরমুগ্ধ উপাসক। আজ এই বেশে ওঁকে দেখলে, গদ্‌গদ ভাষায় কাব্যের মতো করে স্তুতি করত। নানা উপমা-অলঙ্কারে ওঁর সৌন্দর্যের অপরূপত্ব বর্ণনা করত।

সে বোঝে, সে জানে।

গুণগ্রাহী, সৌন্দর্যবোদ্ধা।

একমাত্র সে-ই।

আর ওঁর স্বামী—স্বামী বললে শব্দটার অবমাননা হয়, প্রভু—কিষ্কিন্ধ্যাপতি বালী!

তিনি কখনও, কোনদিনই তাঁর প্রধানা সঙ্গিনী, কিষ্কিন্ধ্যার প্রধানা মহিষীর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন না। রূপের ব্যঞ্জনা তো দূরের কথা, আদৌ কোন দিন ভাল করে চেয়ে দেখেছেন কি তাঁর দিকে! তাঁর কাছে নারী রমণী মাত্র। সকলেই সমান। সম্ভোগের উপকরণ।

অপরাজেয় যোদ্ধা, অপরিমেয় বলশালী, বিশাল দেহ, তেমনি সেই অনুপাতেই তাঁর দুর্বার অনির্বাণ কাম। প্রতিদিন তিন-চারটি স্ত্রীলোক

উপভোগ না করলে তাঁর সে যৌনক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। তাও পূর্ণ নিবৃত্তি হয় কি ?

এই পরিমাণ বিচার-বিবেচনাহীন ক্ষুধা বলেই সম্ভোগপাত্রী নির্বাচনে কোন ইতরবিশেষ নেই বালীর। তারাদেবীর মনে হয়. তিনি এসব স্ত্রীলোকের কোনটিরই মুখের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখেন নি। রূপে তাঁর প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন দেহটার। যৌবনের।

এই যে রুমা, ওঁর জাতা ও সপত্নী (কী বিচিত্র সম্পর্কই না দাঁড়িয়েছে তাঁদের !)—সেও সুন্দরী, যথার্থ সুন্দরী ; অনার্য-দুহিতার দেহলালিত্য ও আকাঙ্ক্ষাযোগ্যতা পূর্ণমাত্রায়ই আছে তার—সেকথা তারাদেবীও স্বীকার করতে বাধ্য। তাকে সম্ভোগ করার জন্যই —সুগ্রীবকে বিতাড়িত করলেও, রুমাকে ছাড়েন নি বালী—তবু তাঁর দিকেই কোন দিন কি চেয়ে দেখেছেন বালী, মুগ্ধ চোখে, প্রশংসার দৃষ্টিতে ! ঐ প্রথম-যৌবন-সরসীতে অর্ধস্ফুট কমলকলিকাটির দিকে ?

না, কোনদিনই না। তা জোর করেই বলতে পারেন তারা। সে প্রয়োজনও নেই, সে দৃষ্টিও নেই।

যদি ওঁকে অবহেলা করে রুমাকে নিয়েই থাকতেন, অন্ততঃ তাকে প্রিয়তমা বলে গণ্য করতেন—তা হলেও তবু, মনুষ্যত্বের না হোক, মানবজনোচিত রুচি ও বিবেচনার অস্তিত্ব বোঝা যেত। তাও না, রুমা অসংখ্য শয্যাসঙ্গিনীর অন্যতমা মাত্র, প্রিয়তমা, বা শ্রেষ্ঠতমাও না।

পশুর মতোই শক্তি লোকটার, পশুর মতোই ব্যবহার। ঠিক সেইরূপই অপরিমাণ কামনা। যেমন প্রচণ্ড ঔদরিক ক্ষুধা, তেমনিই ইন্দ্রিয়জ। আকৃতি ছাড়া সব দিক দিয়েই পশু।

কিন্তু তাই কি ?

তাও বোধহয় সত্য নয়।

কোথায় যেন একটা প্রতিবাদ জাগে তারার নিজের মনেই—চিন্তাটা আসার সঙ্গে সঙ্গেই।

পশুরাও এমন নয়, এতটা নয়।

এই কিষ্কিন্ধ্যায় পশুর অভাব নেই। নিরীহ মেষ মৃগ থেকে বরাহ, সিংহ, ঋক্ষ—সমস্তই আছে। আবার সত্যকার বানর—যাদের শাখামৃগ বলে সারমেয়, এ সবেরও অভাব নেই। তাদের আচরণ প্রায়শঃ, স্বামীসঙ্গ বঞ্চিতা তারা তাঁর দুঃখদায়ক প্রবৃত্তিজর্জবিত অবসর সময়ে, ভালভাবেই নিরীক্ষণ ও লক্ষ্য করেছেন। তাদেব কাম উদ্রেকের বিশেষ কাল আছে, স্ত্রী-পশুরা ঋতুমতী না হলে পুরুষ-পশুব কাছে আসে না, গর্ভবতী হয়েছে বুঝলেই, পুরুষ সংসর্গ পরিহাব কবে, পুরুষরাও তাদের বিবক্ত করে না। একই দিনে এমন বারবার বিভিন্ন স্ত্রী-পশুকে প্রয়োজন হয় না তাদের।

এ লোকটা পশুরও অধম। কে জানে সুদূব দক্ষিণে যে অসভ্য আম-মাংসভোজী লোকগুলি বাস করে বলে তারা শুনেছেন—যাদেব বাক্ষস পিশাচ আখ্যা দেয় আর্যরা—তাদেব মধ্যে এমন আচরণ দেখা যায় কিনা!

সুগ্রীব, হ্যাঁ, সুগ্রীবই তাঁর উপযুক্ত স্বামী, যথার্থ সাথী।

প্রভু বলে মানতেও রাজী আছেন তাবা।

বলবীর্য তাঁর বালীর মতো নয়, সত্য কথা। তবে অপর পরিচিত সব লোকের থেকেই বেশী। বিরাট কলেবর নয়, সুগঠিত সুন্দর দেহ। বিবেচনা আছে, সদসৎ বিচারবুদ্ধি আছে, দয়া-মায়াও আছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার করতে জানে। মিষ্টভাষী, মিতবাক্; অপরকে প্রাপ্য সম্মান দিতে জানে। শুধু স্ত্রীলোকেরই নয়—প্রকৃতির সৌন্দর্যও দেখতে জানে, উপভোগ করার মতো মানসিক গঠন আছে তার। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি যে নব নব রূপ ধারণ করে, সে বিষয়ে সচেতন।

আজ সুগ্রীব কাছে থাকলে, তাঁর এই অপরূপ রূপসজ্জা সার্থক হত।

সুগ্রীব দেখতেন, মুগ্ধ হতেন। প্রসাধনের রহস্য ও কার কি প্রভাব—জানা আছে তাঁর, একবার ওঁর মুখের ওপর চোখ বুলিয়েই

বুঝতে পারতেন, কোথাও কোন ত্রুটি নেই, কোথাও কুরুচি প্রকাশ পায় নি!

তাঁর সেই সু-বর্ণনা ও মুগ্ধতার মুকুরে তারা নিজেও দেখতেন।

সুগ্রীবের কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন অস্থির হয়ে উঠলেন তারা।

যেন মনে হচ্ছে, তাঁকে কে তাড়না করছে কোথাও যাওয়ার জন্য। কিছু একটা উপায় করার জন্য। কঠিন কণ্টকময় বেত্রাঘাত করছে কে, তার জ্বালা তীব্র, দুঃসহ। একমাত্র অপরিমেয় মাধ্বী পান করে অচেতন না হলে এ জ্বালার অবসান হয় না।

তারা জোর করে ঋষ্যমূকের দিক থেকে দৃষ্টি ফেরালেন। কিন্তু তাতেও জ্বালা যেন বৃদ্ধি পেল। চারিদিকের বনস্থলী, হরিৎ-বৃক্ষশীর্ষ শোভিত পর্বতমালা, পুষ্প ও বিভিন্ন সুমিষ্ট ফলবৃক্ষ শোভিত উপত্যকা, সুরম্য নদীতীর দেখে তাঁর বিরহজ্বালা বৃদ্ধি পেল ব্যতীত হ্রাস পেল না। এ সৌন্দর্যের সঙ্গে যে সুগ্রীবের স্মৃতি বিজড়িত। তিনি দেখতেন, তিনি দেখাতেন। প্রতিটি পুষ্পের নাম তাঁর জানা, কোন্ ঋতুতে কোন্ পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, তা তাঁর কণ্ঠস্থ। তাঁর বর্ণনায় এই সৌন্দর্য আরও বেশী উপভোগ্য বোধ হত।

তবু, এই শোভা দৃষ্টিপথে পতিত হওয়া মাত্র আজও তাঁর দুই চোখে যেন কে মায়াকাজল পরিয়ে দিল।

মরি, মরি। আজ এ কী শোভা ধরিত্রীর!

বোধ করি তাঁকে অধিকতর যন্ত্রণা দেওয়ার জন্যই প্রকৃতির এই অপরূপ রূপসজ্জা।

দুই নদীতীরে কত কি লতা, প্রত্যেকটিই বিচিত্র বিভিন্ন বহু বর্ণ পুষ্পভারে আনত; তাদের মিশ্রিত সুগন্ধ এত দূরেও মৃদু বীজনের ন্যায় পবনবাহনে এসে পৌঁচচ্ছে, শুধু গন্ধ নয়—সেই সঙ্গে তাদের গন্ধবাহী পুষ্পরেণুও। পুষ্পদল ও পল্লব এত দূরে আসা সম্ভব নয়, সেগুলি ঐ

নদীতীরের তৃণভূমিতে যেন ওঁদের জন্যই পুষ্পশয্যা রচনা করছে। গঙ্গার দক্ষিণ তটের পর্বতশিখরের হরিৎ বৃক্ষগুলিতে অন্ধকার নেমে আসায় তা ক্রমশঃ মেঘবর্ণ ধারণ করছে, কিন্তু তারই মধ্যে অসংখ্য দীপমালার মতো পুষ্পিত কর্ণিকার শাখাগুলি আরও স্পষ্ট, আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এপারে নিষ্পত্র পুষ্পাকীর্ণ কিংশুক, মালতী, মল্লিকা, করবী—নদীতটের পাশে পাশে মধুগন্ধী পদ্ম, কেতকী, সিন্ধুবার, বাসন্তী, পূর্ণা ও কুন্দ; এদিকে নক্তমাল, মধূক, স্থলবেতস, বকুল, চম্পক ও পুন্নাগ, নীল অশোক; দূরে শৈল-সানুতে সিংহকেশব, লোধ্র, চূত, পাটল ও কোবিদার; মুচকুন্দ, অর্জুন, শিরীষ, শিংশপা ও ধব,* শাল্মলী, কুরুবক, চন্দন ও সান্দন, হিন্তাল ও তিলক; এগুলি যে এমনভাবে একই সঙ্গে পুষ্পিত ও গন্ধবহ হয়ে উঠেছে, সে কি কেবল তাঁকেই যন্ত্রণা দেবার জন্য নয়?

যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ওঠেন তারা, কামনার আবেগে ক্রুদ্ধা সর্পীর মতো অবস্থা হয় তারাদেবীর। তবু কী যে করবেন, কি করলে এই মানসিক জ্বালা, যা অবিলম্বে দৈহিক জ্বালায় পরিণত হবে, তার অবসান বা প্রতিকার হয়, তাও ভেবে পান না। এক এক সময় মনে হয়, এই প্রাসাদের পাষাণ-কট্টিমে মাথা কুটে মরেন। আবার কখনও মনে হয়, নিশীথ রাত্রে নিঃশব্দে উঠে প্রাসাদ দুর্গে অগ্নিসংযোগ করেন—ডাকিনীর মতো, প্রেতিনীর মতো ঘুরে ঘুরে সমস্ত প্রাসাদের কক্ষ দ্বারে দ্বারে তৈলনিষেক করে আগুন ধরিয়ে দেন—যাতে বহ্নিবেষ্টনীতে পুড়ে মরে ঐ পাপিষ্ঠ আর তার পাপসহচরীরা। হ্যাঁ, ওদের ওপরও ওঁর দারুণ ঘৃণা। পুড়ে মরুক বালী আর তার উচ্ছিষ্ট ঐ স্ত্রীলোকগুলো! সেই সঙ্গে নিজেও মরুন। সবাই যাক, তাঁরই বা এভাবে বেঁচে থেকে লাভ কি?

পরক্ষণেই মনে পড়ে যায়—তাঁর পুত্র, এ বংশের এখনও পর্যন্ত

* এখন উড়িষ্যা ও সিংভূমে ধ গাছ নামে পরিচিত। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় এর নাম দিয়েছিলেন শিব বৃক্ষ।

একমাত্র সন্তান কুমার অঙ্গদের কথা। শিউরে ওঠেন সঙ্গে সঙ্গেই। সকলে গেলে, সেও যাবে। হয়ত যাকে ধ্বংস করার জন্য এত আয়োজন, সেই বালীই বেঁচে থাকবে শেষ পর্যন্ত। লোকটা যেন অমর, অজেয়। বহুবার বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, কোন অস্ত্র যেন ওকে বিদ্ধ করতে পা'ব না, অগ্নিতে দগ্ধ হয় না। এমন কি, বোধ করি পর্বতের চাপেও পিষ্ট হবে না লোকটা। অমানুষিক বল, অবিশ্বাস্য সহ্যশক্তি। তার চর্ম যে কোন ধাতু অপেক্ষা অধিক ঘাতসহ।

কোন উপায়ের কথাই মাথায় যায় না বালীকে বিনষ্ট করার। শেষ অবধি ক্ষিপ্তের মতো এসে এতক্ষণের এত যত্নের প্রসাধন ও সজ্জা নিজের হাতে নষ্ট করেন। খুলে ফেলেন সযত্নরচিত কবরী, টেনে ছিঁড়ে ফেলেন বহু বিচিত্র পুষ্পগ্রথিত গুঞ্জমালা, দূরে ফেলে দেন যাবতীয় মণি-মাণিক্য শোভিত অলঙ্কারের রাশি। তারপর ঋক্ষচর্মের সুকোমল শয্যায় আছড়ে পড়ে আকুল হয়ে কাঁদতে থাকেন।

একি শুধুই তারাদেবীর অসহায় অবস্থা, নির্বাপনের-উপায়হীন কামবহ্নির জন্যই এ অস্থিরতা? শুধুই কামনা আর আবেগ, প্রেমের তৃষ্ণা?

না, তার সঙ্গে আত্ম গ্লানিও যে প্রচুর।

সুগ্রীবের সঙ্গে এই যে বিচ্ছেদ—এই নিদারুণ কষ্টদায়ক বিরহজ্বালা—এর জন্য কি উনি নিজেই দায়ী নন? এ যে ওঁরই স্বখাত সলিল।

ওঁরই মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা। হ্যাঁ, মূর্খতাই বলবেন নিজের সে কার্যকে।

সেদিনের কথা, সে সময়ের প্রতিটি ইতিহাস ওঁর মনে আছে। মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের মুখে নিজেরই কালিমা লেপনের ইচ্ছা হয়।

এত কাল বাস করেছেন যার সঙ্গে, যার সন্তান গর্ভে ধারণ করেছেন—তার আসুরিক বল সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা থাকা উচিত ছিল বৈকি।

তা নইলে মায়াবী দানব তাকে বধ কবতে পারবে—এমন অসম্ভব অনুমানই বা করতে যাবেন কেন ?

আম-মাংসভোজী, কদাচারী, পশুচর্মবাস, গুহাবাসী দানবরাই নাকি এখানের আদিমতম অধিবাসী। বিরাটকায় শষ্পভোজী জন্তুদের পরে এরাই বুঝি প্রথম মানব। এই আদিবাসীদেরই দানব, রাক্ষস প্রভৃতি নামে অভিহিত করে আর্যরা। তাদের কাছে এরা সবাই সমান, পশুর সমগোত্রীয়। যদিচ রাক্ষসরা দানবদের থেকে বেশী অগ্রসর, তারা ধাতুর ব্যবহার জানে। কিন্তু আর্যদের কাছে ওঁরাও তো ঐ একই শ্রেণীতে পড়েন ?. অজ্ঞানতা আর কাকে বলে ?

অনার্যরা এদেশ অধিকার করার বহু পূর্ব থেকেই এইসব আদিবাসীরা আছে এখানে, কে জানে সে কতকালের কথা ! এরা বিশেষ এই দানবরা এখনও কৃষিকর্ম শেখে নি। শুধু এত দিনে ওঁদের কাছ থেকে অগ্নি প্রজ্বলনের কৌশলটা আয়ত্ত করেছে মাত্র, যদিচ অগ্নিপক্ক কোন আহার্য এখনও গ্রহণ করে না। পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করে, বৃহৎ শিলাখণ্ডে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড ঘর্ষণ করে সূচীতীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রস্তুত হয়। তবে সে অস্ত্র পশু শিকারের জন্যই ব্যবহৃত হয়—যুদ্ধের সময় বিরাট বিরাট শিলাখণ্ড ও সদ্য-উৎপাটিত বৃক্ষই অস্ত্রের কাজ করে। একক সমরে বাহুবল ও দেহভারই সম্বল।

বালী যখন কিষ্কিন্ধ্যায় রাজ্য বিস্তৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করতে ব্রতী হলেন, তার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর পিতৃ-পিতামহ এখানে আধিপত্য করলেও এই দানবদের ভয় করে চলতেন, ঠিক কর বা উৎকোচ না দিলেও—অবাধ শিকারের ও ফল আহরণের অধিকার স্বীকার করে নিয়ে, এক রকম সখ্য বজায় রেখে চলতেন। এদের মধ্যে বীর্যে ও বুদ্ধিতে দুন্দুভি দানবই ছিল প্রধান। তার ধারণা ছিল, তাকে তুষ্ট না রেখে

কেউ কিষ্কিন্ধ্যায় রাজত্ব করতে পারবে না।

বালী রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করে প্রথমেই এদের দমনে প্রবৃত্ত হলেন। এই বর্বর, অর্ধনর লোকগুলো যদি শাসকের উপরে শাসক হয়ে বসে থাকে তো রাজত্বে ধিক—এই হল তাঁর বক্তব্য। বিবাদ করতে গেলে একটা উপলক্ষ সৃষ্টি প্রয়োজন, সে উপলক্ষ এক একজনের কাছে এক একটা বেশী সুবিধাজনক বোধ হয়। কামকীট বালী একই অস্ত্রে দুই পশু বধ করলেন, দুন্দুভিপুত্র মায়াবী তখন দানবদের মধ্যে প্রধান—তার দুটি তিনটি অপেক্ষাকৃত সুশ্রী সঙ্গিনীকে হরণ করে এনে নিজের অন্তঃপুরভুক্ত করলেন।

মায়াবী অবশ্যই যথাসাধ্য বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বালীর বাহুবল তার অপেক্ষা বহুগুণ বেশী, কিছুক্ষণের মধ্যেই পরাজিত ও সাংঘাতিক আহত হয়ে কোনমতে পলায়ন করে বাঁচল। এর পর আর কোন দানব বালীর বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহস করে নি।

কিন্তু মায়াবী তার অপমান ও এই পরাজয়ের গ্লানি ভোলে নি। সে সাংঘাতিক প্রতিশোধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

ওরা গুহাবাসী, এখন কেউ কেউ প্রস্তরখণ্ডের উপর প্রস্তরখণ্ড চাপিয়ে স্বতন্ত্র গৃহনির্মাণ করলেও, অধিকাংশই গুহাতে বাস নিরাপদ ও আরামদায়ক মনে করে। এই সব গুহার যেটা প্রধান প্রবেশপথ—তার অনেক শাখাপথ ও তার ধারে ধারে গুপ্ত গুহা থাকে। যারা বহুদিন ধরে বা বংশপরম্পরায় বাস করে, তারাই এর রহস্য সম্যক্ আয়ত্ত করতে পারে, অন্য কোন নবাগত ব্যক্তি কৌতূহলী হয়ে সে সঙ্কীর্ণ শাখাপথে প্রবেশ করলে আর ফিরে আসতে পারে না বা অন্যদিকে নির্গমনের মুক্তিদ্বার খুঁজে পায় না। অন্ধকার পথে ক্রমাগত ঘুরতে ঘুরতে হয়ত বা একই পথে বারবার ঘুরে অনাহারে প্রাণ দেয়।

মায়াবী তার রণভূমি হিসেবে এমনিই একটি বহু শাখা বা গুপ্তপথ-বিশিষ্ট বিশাল গুহা নির্বাচন করেছিল। তার মধ্যে বেশ কিছুকাল

ধরে বিস্তর প্রস্তরখণ্ড ও প্রস্তরনির্মিত অস্ত্র স্তূপীকৃত করেছে, সেই সঙ্গে নিজের জন্য কিছু আহার্যও। এই ধরনের গুহার মধ্যেই ঝরনা থাকে, সুতরাং পানীয় জলের জন্য কোন চিন্তা ছিল না।

আয়োজন শেষ করে, একদা গভীর রাত্রে এই প্রাসাদের দ্বারে এসে বিকট গর্জন ও আস্ফালন করতে লাগল। সে কোন বীরের হুঙ্কার নয়—উন্মত্ত পশুর মতো এক ধরনের কদর্য চিৎকার।

চন্দ্রকরোজ্জ্বল রাত্রি। বিস্মিত, ক্রুদ্ধ ও অকাল-নিদ্রাভঙ্গে বিরক্ত বালী প্রাসাদ-প্রাকারে এসেই ওকে দেখে চিনতে পারলেন। মাত্র বৎসর-খানেক পূর্বে প্রহার করে যার অস্থি পর্যন্ত চূর্ণ করে দেহটাকে প্রায় পিণ্ডাকার করে দিয়েছিলেন—সে নির্লজ্জ আবার কোন্ সাহসে তাঁকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করতে এসেছে? তবে কি সে আরও বহু স্বজাতীয়কে সঙ্গে করে এনেছে? তিনি দুর্গ থেকে বহির্গত হলেই তারা অতর্কিতে চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করবে? অবশ্য দানবমহলেও তাঁর কিছু কিছু গুপ্তচর আছে—তারাও দানব, নানা প্রকার লোভে তারা বালীর বশীভূত, তেমন কোন ষড়যন্ত্র দেখলে নিশ্চয়ই সংবাদ দিত। নাকি ওরাই বিশ্বাস-ঘাতকতা করল?

নানা কুটিল সন্দেহ কয়েক লহমার মধ্যেই মনে দেখা দিল।

তবে সে যাই হোক, অপর কারও, বিশেষ বর্বর দানবের তর্জন গর্জন সহ্য করে, রাত্রি প্রভাত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন কি সৈন্যসজ্জার আদেশ দেবেন, বালীর অত ধৈর্য নেই। তাঁরও ক্রোধ কতকটা জান্তব, ওদের সমানই। তিনি তখনই কুৎসিত ভাষায় ওকে যথেচ্ছ গালি দিয়ে চর্মাবৃত হয়ে তখনই দুর্গ থেকে বহির্গমনের উদ্যোগ করলেন।

বালী অদূরদর্শী ও হঠকারী হলেও তাঁকে সুমন্ত্রণা দেবার লোকের অভাব ছিল না। মন্ত্রী জাম্বুমান, মহাবীর হনুমান, নল, নীল প্রভৃতি বিচক্ষণ পার্ষদগণ সকলেই তাঁকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করলেন।

সেদিন যে ব্যক্তি সাংঘাতিকভাবে প্রহৃত, লাঞ্ছিত হয়ে কোনমতে পলায়ন করে প্রাণ বাঁচিয়েছে, সে আজ কোন ভরসায় এসে এমন

পাশবিক চিৎকার শুরু করে! এই দুঃসাহস ও আপাত-নির্বুদ্ধিতার পিছনে নিশ্চয়ই কোন সুচিন্তিত কু-অভিসন্ধি আছে, গভীর কোন ষড়যন্ত্র! না হলে এত রাত্রেই বা আসবে কেন? প্রভাতের জন্যও তো অপেক্ষা করতে পারত? দুন্দুভি দানব ইন্দ্রজালে সুদক্ষ ছিল, মায়াবী তারই পুত্র, নিশ্চয়ই বহু মায়াকৌশল তার জানা আছে।

তা হলেও এ দুর্গ সে ভেদ করতে পারবে না। অন্য কোনভাবে এলে আর দ্বন্দ্বযুদ্ধের কোন প্রশ্ন থাকবে না, তাঁরা সকলে মিলে ওকে বধ করতে পারবেন। রাত্রি প্রভাত পর্যন্ত সে এমনি উচ্চ গর্জনে নিজের কণ্ঠস্বরই ভঙ্গ করুক—প্রভাতে সদলবলে দুর্গ থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ।

নিষেধ করেছিলেন সুগ্রীবও। করজোড়ে অনুরোধ করেছিলেন এমন হঠকারিতা না করতে। বালীর অসংখ্য পত্নী বা সঙ্গিনীরা সক্রন্দনে পথরোধ করার চেষ্টা করেছিল।

নিষেধ করেছিলেন তারাও।

হ্যাঁ, তিনিও করেছিলেন, কণ্ঠস্বরে যথোপযুক্ত আকুলতাও এনেছিলেন, নইলে দৃষ্টিকটু হয়।

তবে এমন ভাষা ব্যবহার করেছিলেন সে উদ্বেগ প্রকাশে, যাতে বালীর শৌর্যের প্রতি কটাক্ষ থাকে একটু। বয়স হয়েছে, সুখে ও সম্ভোগে অভ্যস্ত হয়ে পূর্বের যুদ্ধাভ্যাসের তীক্ষ্ণতা নিশ্চয়ই কিছু নষ্ট হয়েছে—বিশেষ বিস্তর প্রমদাসংসর্গে নিত্য শক্তিক্ষয় হচ্ছে, এখন এমন দুঃসাহসে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়। অপর দিকে ঐ মায়াবীটা একা বিজন অরণ্যে আত্মগোপন করে থেকে নিশ্চয়ই প্রভূত দেহবলের অধিকারী হয়েছে, ইত্যাদি।

তাতেই আরও অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়েছিল। একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন বালী।

তিনিও একটা হিংস্র পাশবিক চিৎকার করে উঠে ওঁদের সরিয়ে, কণ্ঠলগ্ন তরুণী মেয়েটিকে শিলা কুট্টিমে আছড়ে ফেলে, দুর্গ সম্মুখস্থ বিস্তৃত

মুক্ত প্রান্তরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

সঙ্গেও আর কাউকে নিতে সম্মত হন নি।

সেটা বোধহয় তাঁর এত দিনের বীর্যখ্যাতির অহঙ্কারে বেধেছিল।

শুধু সুগ্রীব কোন কথাই শোনেন নি, তিনিই সঙ্গে গিয়েছিলেন।

তারা জানেন না, এটা শুধু ভ্রাতৃপ্রেম, না তাঁর কোন গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। তবে সুগ্রীবের এই সহগমনটা তাঁর ভাল লাগে নি, কারণ ঠিক এই আকস্মিক ঘটনার পূর্বে তিনি সুগ্রীবের সান্নিধ্যেই ছিলেন।

সেদিন অপরাহ্নে তারাকে প্রজ্বলন্ত অগ্নিশিখার মতো রূপ ও রূপসজ্জায় দীপ্তি পেতে দেখে সুগ্রীব আর নিজেকে স্থির রাখতে পারেন নি! তবু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিল, বালীর অভিরুচি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় প্রহরের প্রারম্ভে বালীর শয়নকক্ষে চারিটি সুনির্বাচিত তরুণীকে প্রবেশ করতে দেখে নিশ্চিত বুঝেছিলেন, সে রাত্রে তারাকে বালীর প্রয়োজন হবে না। সে সুযোগ নিতেও আর বিলম্ব করেন নি, যথাসম্ভব আত্মগোপন করে তিনি তারার শয়নকক্ষে প্রবেশ করেছিলেন এবং নিজের অতুলনীয় কাব্যসম্পদপূর্ণ ভাষায় তারার স্তুতিগান করছিলেন। তারা এই আগমন প্রত্যাশাই করেছিলেন, সে আভাস পেয়েছিলেন তিনি সুগ্রীবের প্রায়-উন্মত্ত চেতনাহীন দৃষ্টিতে। তিনি তাঁর রক্তকমলের মতো সুকোমল চরণ যুগল সুগ্রীবের অঙ্কে তুলে দিয়ে মুগ্ধ মনে সেই রূপ বর্ণনার মধু পান করছিলেন। সে সময় যে এমন দানবীয় ব্যাঘাত ঘটবে, রূঢ় আঘাতে, কর্কশ ধ্বনিতে সে স্বপ্নভঙ্গ হবে—তা দু'জনের একজনও আশঙ্কা করতে পারেন নি।

সেই জন্যই সুগ্রীবের এই সম্ভাব্য অজ্ঞাত বিপদের মধ্যে যাওয়াটা তাঁর আদৌ ভাল লাগে নি।

তবু তখনও, এইভাবে দীর্ঘকাল সংশয়, আশঙ্কা ও আকুলতার মধ্যে

থাকতে হবে, তাও কল্পনা করতে পারেন নি।

নিশাবসানের পূর্বেই না হোক, বড়জোর প্রভাতের দুই দণ্ডকালের মধ্যে ওঁরা দুই ভাই শত্রু বধ করে ফিরে আসবেন—এমনই আশা করেছিলেন।

কিন্তু প্রভাত মধ্যাহ্নে, মধ্যাহ্ন এক সময় সন্ধ্যায় পর্যবসিত হল, আবার রাত্রি, সে রাত্রিরও অবসান ঘটল—তব কেউই প্রত্যাগমন করলেন না। তখন উৎকণ্ঠিত মন্ত্রিগণ ও সভাসদগণ সংবাদের জন্য ব্যস্ত হলেন, চর ও কিছু কিছু সৈনিক তো প্রেরিত হলই, নিজেরাও চারিদিকের পর্বত উপত্যকা নদীতীরে অনুসন্ধান করতে লাগলেন। সুপরিকল্পিতভাবে কে কোন্ দিকে যাবেন এবং কতদূর পর্যন্ত—তা পূর্বেই স্থির করে নিলেন, যাতে একই স্থানে বহু লোক গিয়ে অন্য স্থান একেবারেই অনন্যসন্ধিত না থাকে।

তবু সংবাদ পেতে আরও দু'দিন সময় লাগল এবং সে সংবাদও চিন্তা সম্পূর্ণ দূর করার মতো নয়।

আসলে প্রবীণদের অনুমানই সত্য। দুর্বৃত্ত এবার বল অপেক্ষা কৌশলের উপরই নির্ভর করেছে বেশী।

বালী দুর্গের বাহিরে আসা মাত্র সে পশ্চাদপসরণ করতে আরম্ভ করেছে, এবং শেষ পর্যন্ত দ্রুতবেগে পলায়নের ভান করেছে। ক্রুদ্ধ বালী তার স্পর্ধা চিরদিনের মতো শেষ করার অভিপ্রায়ে—এটা সত্যই ভয় না ভয়ের অভিনয়, সে কথা চিন্তা না করেই অন্ধভাবে তার পশ্চাদ্ধাবন করেছেন। অকালে বিশ্রামে ব্যাঘাত করায় অপরিসীম ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, এখন এই কাপুরুষতা দেখে যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হয়ে উঠলেন।

বর্বরটা দুষ্ট ক্ষতের মতো বারবার অশান্তির কারণ হচ্ছে, তাকে শল্যচিকিৎসার মতো একেবারে নির্মূল করাই শ্রেয়ঃ—এই বিবেচনাতেই তিনি অগ্রপশ্চাৎ কিছু চিন্তা না করে কোন্ দিকে যাচ্ছেন, সে বিষয়ে সচেতন না হয়ে শুধুই ধূর্ত মায়াবীর পিছনে ছুটেছিলেন।

কিন্তু মায়াবীর দেহ বালী অপেক্ষা অনেক লঘু, তদুপরি তপস্যার

মতো করে এইসব সম্ভাব্য ঘটনার জন্য প্রস্তুত হয়েছে এতদিন, বালী যতই নিজের বেগ দ্রুততর করুন—মায়াবী অনায়াসে ততই এগিয়ে যেতে থাকে, দু'জনের ব্যবধান কিছুতেই হ্রাস পায় না।

এইভাবে ছুটতে ছুটতে দুজনেই পর্বতে উঠেছেন এবং এক সময় এক অন্ধকার অন্তহীন গুহামুখে পৌঁছেছেন। মায়াবীর এইরূপই অভিসন্ধি ছিল, সে এক সময় যেন পলকপাত-মাত্র গুহার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বালীর তখনই তার দুরভিপ্রায় অনুমান করা উচিত ছিল। রাজকার্য যে পরিচালনা করে, তার এ বিষয়ে কিছু জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা না থাকার কথা নয়, রাজনীতিতে সর্বদাই অগ্রপশ্চাৎ চিন্তনা এবং হিসাববোধ প্রয়োজন। কিন্তু বালী তখন এই দুষ্টটার নষ্টামিতে এতই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন যে এসব কোন চিন্তাই তাঁর মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নি। ক্রোধকে এই কারণেই মানবের প্রধান শত্রু বলা হয়, ক্রুদ্ধ হলেই সর্বাগ্রে বুদ্ধি-বিভ্রম ঘটে।

শুধু দৈবক্রমেই যেন, একেবারে শেষ মুহূর্তে কিছু চৈতন্য ফিরেছে। সুগ্রীবকে বলেছেন, 'তুমি এখানেই থাক, গুহামুখ পাহারা দাও, দানবটা হয়ত পাশেই কোথাও আত্মগোপন করে আছে, আমি ভিতরে গেলেই পলায়নের চেষ্টা করতে পারে। আমি ওকে বধ করে ফিরে না আসা পর্যন্ত কোথাও যেও না। কোন ওর পাপ-সহচর না পিছন থেকে আমাকে আক্রমণ করতে পারে, সে বিষয়েও সতর্ক থাকা প্রয়োজন।'

সেই অনুজ্ঞামতোই সুগ্রীব সেখানে অপেক্ষা করছেন। রাজপুরীতে এসে এঁদের সংবাদ দিতে পারেন নি।

॥ তিন ॥

তবু তখনও মায়াধর মায়াবীর চক্রান্তটা সম্পূর্ণ বোঝা যায় নি।

সুগ্রীবের প্রতীক্ষা যে এত দীর্ঘস্থায়ী হবে, তাও কেউ ভাবতে পারেন নি।

একদিন, দুই দিন, সপ্তাহ, মাস। ঋতুও পার হয়ে গেল।

মন্ত্রীরা অন্য প্রহরী নিযুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কয়েকজন করে পর্যায়ক্রমে পাহারা দিক, বিশ্বস্ত রণকৌশলী প্রহরীই দেবেন তাঁরা —কিন্তু সুগ্রীব সম্মত হন নি বা হতে সাহস করেন নি।

বালীর যে কোন নির্দেশ অমান্য করাটা তাঁর কাছে অমার্জনীয় অপরাধ, তা সে যে কোন কারণই ঘটুক না কেন। দ্বিতীয়তঃ যদি, সত্যই তাঁর কোন বিপদ ঘটে ? যদি সত্যই সুগ্রীবকে প্রয়োজন হয় ? দুর্ধর্ষ ও মায়াকৌশলী মায়াবীর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাকে বধ করতে পাবে একমাত্র বালী, এবং তাঁর পরই সুগ্রীব। আর কারও সাধ্য নেই।

অগত্যা প্রবীণ ব্যক্তিরা মন্ত্রণা করে বর্ষা, হিম ও রৌদ্রতাপ থেকে তাঁকে রক্ষা করার জন্য সেখানেই বৃক্ষশাখা ও পত্রপল্লব দিয়ে একটি আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে প্রচুর ফল ও পানীয় জলের সংস্থান রেখে ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। বালী ও সুগ্রীব দুজনেই অনুপস্থিত জানলে সামগ্রিকভাবে দানবদের অভ্যুত্থান অসম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে রাজপ্রধানদের থাকা প্রয়োজন।

শুধু স্থির বইল, একটি করে পরিচারক বা প্রহরী প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় সুগ্রীবেব সংবাদ নিয়ে, কোন প্রয়োজন থাকলে, তা সরবরাহ করে যাবে।

তবু তখনও কেউ ভাবেন নি যে সুগ্রীবকে বৎসরকাল এইভাবে একা থাকতে হবে। অতন্দ্র, সদাসতর্ক প্রহরায়।

এক মাসের পর আর এক মাস, তার সঙ্গে আরও এক মাস যুক্ত হল।

ঘনান্ত হেমন্ত শিশির। মাসের সঙ্গে মাস, ঋতুর সঙ্গে ঋতু ক্রমান্বয়ে যোগ হয়। শিশিরের পর বসন্ত, নিদাঘ, বর্ষা।

যেখানে একদিন অতিবাহিত করাই দুঃসহ, সেখানে এই দীর্ঘ অদর্শন ক্রমে তারাকে আকুল, প্রায় উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে।

এধারে প্রকৃতির ঘন ঘন রূপান্তর—রূপ থেকে রূপে যেন জন্মান্তর —তাঁর বিরহব্যথাকে দ্বিগুণতর বর্ধিত করে। মনে হয়, প্রকৃতির এই

সজ্জা-পরিবর্তন—এ তাঁর ভাগ্যের, বিধাতারই ষড়যন্ত্র—তাঁকে এই নিদারুণ যন্ত্রণা দেবার জন্যই। প্রকৃতি ভাগ্যেরই যন্ত্রমাত্র।

জীবনই দুর্বিষহ বিষবৎ মনে হয়। আর কিছু নয়, যদি শুধু দিনান্তে একবার সুগ্রীবের দর্শনও পেতেন!

তাঁর মুগ্ধ চোখের দর্পণে নিজের রূপলাবণ্য যৌবনের প্রতিবিম্ব দেখে আশ্বস্ত হতে পারতেন।

কিন্তু যেখানে রুমা গৃহপ্রান্তে শান্ত হয়ে অপেক্ষা করছে, সেখানে তাঁর সুগ্রীবকে দেখতে যাওয়া যে বড়ই দৃষ্টিকটু হয়।

যত এসব চিন্তা করেন, ততই একটা দৈহিক জ্বালা অনুভূত হয়। রুমা কেন এত নির্বিকার, এ প্রশ্নও মনে জাগে বৈকি। হয়ত এতদিনে সে বালীর প্রতিই বেশী আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। সে বালীর জন্যই উৎকণ্ঠিত বেশী। অথবা সুগ্রীবের মন কোথায় আবদ্ধ তা বুঝে তাঁর সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হয়েছে।

ঐ মেয়েটাকেও যদি বালীর সঙ্গে ঐ অন্ধ, মৃত্যু বিভীষিকাময় গুহায় পাঠানো যেত তো বেশ হত। সুগ্রীব ফিরে এলে তাঁদের মিলন চক্ষু-লজ্জার বাধাশূন্য হত।

ঘরেও থাকতে পারেন না, বাহিরের মুক্ত অলিন্দে বা ছাদে এসে দাঁড়ালেও যেন বিশ্বসুদ্ধ তাঁর শত্রু, এই কথাটাই বেশী করে মনে পড়ে।

আশ্চর্য, এত কাল এই অলিন্দ, দুর্গ-প্রাকার, দুর্গের সর্বোচ্চ স্থান থেকে চারিদিকের বহুদূরব্যাপী বন, পর্বত, নদীর শোভা নিরীক্ষণ করেছেন, তা সুন্দর বোধ করেছেন, কিন্তু তা যে এত কামোদ্দীপক, এমন তো কখনও মনে হয় নি।

বিশেষ এই বর্ষায়—সমস্ত পৃথিবী যেন প্রিয়-মিলন-প্রত্যাশায় অধীর উন্মত্ত হয়ে উঠেছে।

ঐ দূরে প্রস্রবণগিরি, সহজেই এখান থেকে মেঘবর্ণ মনে হয়, এখন নীল নীরদ ঘনীভূত হয়ে সে বর্ণ আরও নিবিড়, আরও নীলাভ হয়ে উঠেছে। আর তারই ছায়ান্ধকারে গিরিশৃঙ্গের গহন অরণ্যও মেঘ-

লোকের মতো প্রতীয়মান হচ্ছে—ছায়াতে-মেঘেতে, নীলে-সবুজে একাকার হয়ে গেছে। ঐ ঋষ্যমূক, অপেক্ষাকৃত নিকটে কিন্তু তৎসত্ত্বেও কম স্বপ্নময়, কম মেঘমেদুর ছায়ানিবিড় নয়।

এমন কি পর্বত অরণ্যে সিংহ, ভল্লুক, শার্দূল প্রভৃতি ভয়ঙ্কর পশুদের গর্জনও যেন মধুর মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে এও প্রিয়মিলন আবাহনই। দূর বনান্ত থেকে ভেসে আসা গম্ভীর কেকাধ্বনি, মৃদু মৃদু মেঘগর্জন সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গত বলে বোধ হচ্ছে—মধুময়, কামনা-উদ্দীপক !

দূরদৃষ্ট পর্বতগুলিতে বিক্ষিপ্ত বা অঙ্গীভূত ধাতুময় শিলাগুলি বিভিন্ন ধাতুর বর্ণে শ্বেত, রক্ত, পীত, কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করেছে। মনে হয়, যেন শ্যামবর্ণ দয়িতের কণ্ঠে বিবিধ মহামূল্য রত্নহার।

কিন্তু শুধুই কি মণিহার ? প্রকৃতি সেই সঙ্গে পুষ্পমালোরও কি আয়োজন করেন নি ? মালতী, কুন্দ, সিন্ধুবার*, শিরীষ, কদম্ব, শর্জ বা শাল, কেতকী ; হীরকোজ্জ্বল উপলাহত নির্ঝরিণী-সমূহের দুই কূলে চন্দন, তিলক, অতিমুক্ত, সরল, অশোক, বকুল, হিন্তাল, তিনিস, বেতস, কদম্ব প্রভৃতি বৃক্ষগুলিও যেন পুষ্প প্রসবের আশায় মদনরঙ্গে মেতে উঠেছে। নদীগুলি চলেছে সাগরের অভিসারে, নদীতীরও যেন চক্রবাক, ক্রৌঞ্চমিথুনদের মৈথুনশ্রান্তি অপনোদনের জন্য পদ্ম ও কুমুদ-কলিকার মধুপাত্র সাজিয়ে বসে আছে।

সর্বত্রই প্রকৃতির এই এক ইঙ্গিত।

মেঘগুলিও মেঘ নয়, তারা যেন সূর্যরশ্মির মিলনে সমুদ্রবীর্য গ্রহণ করে এতকাল গর্ভভার বহন করছিল, এখন শস্যক্ষেত্রে জল প্রসব করছে। আবার মনে হয়, ঐ নদীসকল মেঘরূপ সোপান বেয়ে উঠে পর্বতশীর্ষ থেকে কুটজ কুসুম-মাল্যে সূর্যকে বরণ করছে। সন্ধ্যামেঘের পাণ্ডু-পীতবর্ণ কি স্নিগ্ধ চন্দনপঙ্ক ? সূর্যের কামজ্বালা নিবারণ করছে অথবা তাঁকে রাত্রির অভিসারের জন্য সজ্জিত করছে ?

* শ্বেত নিশিন্দা।

আকাশকেও আজ বিরহী বোধ হচ্ছে, মৃদুল বায়ু তার দীর্ঘশ্বাস, জলকণাগুলি বেদনাবাষ্প।

তারাব মনে হয়, এই বিরহব্যথাই বুঝি কাব্যের জনক, নইলে প্রকৃতির এ রূপ তো এমনভাবে তাঁর দৃষ্টিতে পড়ে নি ইতিপূর্বে! কে জানে তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার অতৃপ্ত তৃষ্ণাতেই সুগ্রীবের মুখ থেকে অত সুন্দর কাব্যধর্মী ভাষা নিঃসৃত হত কিনা!

বালীব আশা সকলেই ত্যাগ করেছেন, কেবল তাঁব অনুজ সুগ্রীব ছাড়া।

তিনি জ্যেষ্ঠের নির্দেশ পিতার আদেশের মতোই শিরোধার্য করে এখনও সেই গুহামুখে প্রহরায় নিযুক্ত আছেন।

মন্ত্রী ও সুহৃদবা চিন্তিত। চিন্তিত দেশ ও রাজ্যের কথা চিন্তা কবে।

তাঁরা বোঝান, এত কাল কোন প্রাণী বিনা খাদ্যে জীবিত থাকতে পাবে না। বালী দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয়ী হলে তো এই পথেই বেরিয়ে আসতেন। হয়তো অন্ধকার অজ্ঞাত জটিল পথচক্রে ক্রমাগত আবর্তিত হতে হতে শ্রান্তিতে হতাশায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন—দানবদের পৈশূন্য তো সর্বজনবিদিত, এত দিন ধরে এই জন্যই প্রস্তুত হয়েছে, বালীর সঙ্গে সবল যুদ্ধে জয়ী হতে পারবে না জেনেই এই কৌশল অবলম্বন করেছে।

সে পরাজিত হলে বালী নিশ্চয়ই বৃথা গুহামধ্যে কালক্ষেপ করতেন না। ঐ পাপিষ্ঠটা এখানে সুগ্রীব ও অন্যান্য বীরগণ আছে জেনেই অন্য কোন পথে পলায়ন করেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে বালী বিগত হয়েছেন জেনেই ওঁদের তদনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। রাজ্য অধিক-কাল শাসকশূন্য থাকলে বহুবিধ বিপদের সম্ভাবনা। বিজিত আদিম অধিবাসীরা প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টায় চঞ্চল হয়ে উঠবে, ওঁদের নিজেদের মধ্যেও শক্তি গ্রহণের জন্য লোলুপতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেবে, তা থেকে অন্তর্দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী।

লোকের মতে প্রতীয়মান হচ্ছে—ছায়াতে-মেঘেতে, নীলে-সবুজে একাকার হয়ে গেছে। ঐ ঋষ্যমূক, অপেক্ষাকৃত নিকটে কিন্তু তৎসত্ত্বেও কম স্বপ্নময়, কম মেঘমেদুর ছায়ানিবিড় নয়।

এমন কি পর্বত অরণ্যে সিংহ, ভল্লুক, শার্দূল প্রভৃতি ভয়ঙ্কর পশুদের গর্জনও যেন মধুর মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে এও প্রিয়মিলন আবাহনই। দূর বনান্ত থেকে ভেসে আসা গম্ভীর কেকাধ্বনি, মৃদু মৃদু মেঘগর্জন সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গত বলে বোধ হচ্ছে—মধুময়, কামনা-উদ্দীপক!

দূরদৃষ্ট পর্বতগুলিতে বিক্ষিপ্ত বা অঙ্গীভূত ধাতুময় শিলাগুলি বিভিন্ন ধাতুর বর্ণে শ্বেত, রক্ত, পীত, কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করেছে। মনে হয়, যেন শ্যামবর্ণ দয়িতের কণ্ঠে বিবিধ মহামূল্য রত্নহার।

কিন্তু শুধুই কি মণিহার? প্রকৃতি সেই সঙ্গে পুষ্পমাল্যেরও কি আয়োজন করেন নি? মালতী, কুন্দ, সিন্ধুবার*, শিরীষ, কদম্ব, শর্জ বা শাল, কেতকী; হীরকোজ্জ্বল উপলাহত নির্ঝরিণী-সমূহের দুই কূলে চন্দন, তিলক, অতিমুক্ত, সরল, অশোক, বকুল, হিন্তাল, তিনিস, বেতস, কদম্ব প্রভৃতি বৃক্ষগুলিও যেন পুষ্প প্রসবের আশায় মদনরঙ্গে মেতে উঠেছে। নদীগুলি চলেছে সাগরের অভিসারে, নদীতীরও যেন চক্রবাক, ক্রৌঞ্চমিথুনদের মৈথুনশ্রান্তি অপনোদনের জন্য পদ্ম ও কুমুদ-কলিকার মধুপাত্র সাজিয়ে বসে আছে।

সর্বত্রই প্রকৃতির এই এক ইঙ্গিত।

মেঘগুলিও মেঘ নয়, তারা যেন সূর্যরশ্মির মিলনে সমুদ্রবীর্য গ্রহণ করে এতকাল গর্ভভার বহন করছিল, এখন শস্যক্ষেত্রে জল প্রসব করছে। আবার মনে হয়, ঐ নদীসকল মেঘরূপ সোপান বেয়ে উঠে পর্বতশীর্ষ থেকে কুটজ কুসুম-মাল্যে সূর্যকে বরণ করছে। সন্ধ্যামেঘের পাণ্ডু-পীতবর্ণ কি স্নিগ্ধ চন্দনপঙ্ক? সূর্যের কামজ্বালা নিবারণ করছে অথবা তাঁকে রাত্রির অভিসারের জন্য সজ্জিত করছে?

* শ্বেত নিশিন্দা।

আকাশকেও আজ বিরহী বোধ হচ্ছে, মৃদুল বায়ু তার দীর্ঘশ্বাস, জলকণাগুলি বেদনাবাষ্প।

তারার মনে হয়, এই বিরহব্যথাই বুঝি কাব্যের জনক, নইলে প্রকৃতির এ রূপ তো এমনভাবে তাঁর দৃষ্টিতে পড়ে নি ইতিপূর্বে! কে জানে তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার অতৃপ্ত তৃষ্ণাতেই সুগ্রীবের মুখ থেকে অত সুন্দর কাব্যধর্মী ভাষা নিঃসৃত হত কিনা!

বালীর আশা সকলেই ত্যাগ করেছেন, কেবল তাঁর অনুজ সুগ্রীব ছাড়া।

তিনি জ্যেষ্ঠের নির্দেশ পিতার আদেশের মতোই শিরোধার্য করে এখনও সেই গুহামুখে প্রহরায় নিযুক্ত আছেন।

মন্ত্রী ও সুহৃদরা চিন্তিত। চিন্তিত দেশ ও রাজ্যের কথা চিন্তা করে।

তাঁরা বোঝান, এত কাল কোন প্রাণী বিনা খাদ্যে জীবিত থাকতে পারে না। বালী দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয়ী হলে তো এই পথেই বেরিয়ে আসতেন। হয়তো অন্ধকার অজ্ঞাত জটিল পথচক্রে ক্রমাগত আবর্তিত হতে হতে শ্রান্তিতে হতাশায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন—দানবদের পৈশূন্য তো সর্বজনবিদিত, এত দিন ধরে এই জন্যই প্রস্তুত হয়েছে, বালীর সঙ্গে সবল যুদ্ধে জয়ী হতে পারবে না জেনেই এই কৌশল অবলম্বন করেছে।

সে পরাজিত হলে বালী নিশ্চয়ই বৃথা গুহামধ্যে কালক্ষেপ করতেন না। ঐ পাপিষ্ঠটা এখানে সুগ্রীব ও অন্যান্য বীরগণ আছে জেনেই অন্য কোন পথে পলায়ন করেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে বালী বিগত হয়েছেন জেনেই ওঁদের তদনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। রাজ্য অধিক-কাল শাসকশূন্য থাকলে বহুবিধ বিপদের সম্ভাবনা। বিজিত আদিম অধিবাসীরা প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টায় চঞ্চল হয়ে উঠবে, ওঁদের নিজেদের মধ্যেও শক্তি গ্রহণের জন্য লোলুপতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেবে, তা থেকে অন্তর্দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী।

সুতরাং অবিলম্বে সর্ববাদীসম্মত, বিধিমতো একজন শাসক বরণ কর্তব্য। কুমার অঙ্গদ বালক মাত্র, তার বুদ্ধি পরিপক্ক হয় নি, অভিজ্ঞতার অবসর পায় নি। পিতার প্রশ্রয়ে লালিত—রাজনীতির জটিলতা ও কুটিলতা—কিছুই অবগত নয় সে। এক্ষেত্রে, সকল দিক বিবেচনা করে পূর্বিতা অনুযায়ী সুগ্রীবেরই অবিলম্বে শাসনভার গ্রহণ করা কর্তব্য। তাঁর যদি এ বিষয়ে কোন বিবেকের বাধা থাকে, তাহলে তিনি স্বীয় শাসকভার গ্রহণ অনুষ্ঠানের সঙ্গেই অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন, পরবর্তীকালের জন্য তার অধিকার সর্বসমক্ষে স্বীকার করে নিন।

কথাগুলি যুক্তিযুক্ত, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তত্রাচ সুগ্রীব ক্রমাগত কালহরণ করছিলেন, দীর্ঘকাল সময় নিয়েছিলেন প্রধানদের এই সকল যুক্তি ও প্রস্তাব বিবেচনা করতে।

তার কারণ এরা ঠিক বুঝবে না, তিনি যতটা বুঝছেন।

বালীর বলবীর্য এবং ক্রোধ তুটোরই পরিমাণ সুগ্রীব বিলক্ষণ অবগত আছেন।

বালী এত সহজে নিহত হবেন, তা কিছুতেই বিশ্বাস হয় না ওঁর।

মায়াবী হয়ত কোন কৌশলে ওঁকে আবদ্ধ রেখেছে, অথবা অপর কোন বহির্পথ দিয়ে পলায়নের চেষ্টা করেছে, বালীও তার পশ্চাদ্ধাবন করেছেন। এইভাবে ছলনার সাহায্যে গহন অরণ্য বা পর্বত-জটিলতার মধ্যে নিয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়। একদিন না একদিন মায়াবীকে বধ করে বালী ফিরে আসবেন, আর সেদিন কোন যুক্তি বা কারণ বুঝতে চাইবেন না। সুগ্রীব তাঁর আদেশ পালন করে নি, এইটেই সর্ববৃহৎ অপরাধ গণ্য হবে এবং ওঁর লাঞ্ছনার অবধি থাকবে না। আজ যাঁরা তাঁকে এইসব উপদেশ দিচ্ছেন, তাঁদের কাউকেই সে সর্বধ্বংসী রোষবহ্নির সম্মুখে পড়তে হবে না।

এইসব প্রশ্নই এ সমস্যা সমাধানের বিপুল বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

বালীকে এঁরা কেউ এত চেনেন না, সুগ্রীব যতটা চিনেছেন।

এই সময়েই তারা একটা বিরাট ভুল করে বসলেন। বোধ করি তা স্বাভাবিকও।

মানুষের কাম বা কামনা যখন সহ্যের সীমা অতিক্রম করে, তখন সে অন্ধ হয়ে যায়—নিজের শুভাশুভ চিন্তা করার শক্তি বা ইচ্ছা হারিয়ে ফেলে।

তারারও সেই অবস্থা তখন। বৃদ্ধ মন্ত্রীদের যুক্তি যা করতে সক্ষম হয় নি, হয়ত তাঁর রূপলাবণ্য সে উদ্দেশ্য সাধন করতে পারবে—এই আশা ও বিশ্বাসেই তিনি এক দুরূহ ও দুঃসাহসিক কর্মে ব্রতী হলেন।

একদা সূর্যাস্তের পর প্রহরীদের অজ্ঞাতে দুর্গপ্রাচীর উল্লঙ্ঘন করে তিনি বনপথ অবলম্বন করলেন এবং জব অর্থাৎ দ্রুতবেগ অবলম্বনে হরিণীর মতো লঘুপদে মধ্যরাত্রের পূর্বেই সেই গুহামুখে পৌঁছে গেলেন।

এব জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন গত কয়েকদিন থেকেই। তাঁর কয়েকটি বিশ্বস্ত বেতনভুক পুরুষ চর ছিল (স্ত্রীলোককে বিশ্বাস নেই, কোন কথা গোপন রাখতে জানে না), তাদের পাঠিয়ে শুষ্ক মৃত্তিকার পটে ঐ গুহা অবধি যাওয়ার পথের একটা রেখাচিত্র খোদিত করিয়ে নিয়েছিলেন, সেই পট নিয়ে একান্তে উপরের প্রাসাদ-চূড়া থেকে যতদূর দৃষ্টি যায় সেই চিত্রের সঙ্গে পথ—দু'দিকের বনস্পতি-গুলিকেই চিহ্ন রাখা হয়েছিল, চেনার অসুবিধা না হয় সেই জন্য,—মিলিয়ে নিয়েছিলেন। অতঃপর প্রহরীদের আসবের সঙ্গে দুই তিন বিন্দু ধুতুরার রস মিশিয়ে তাদের অচৈতন্য রাখার ব্যবস্থাতেও ত্রুটি হয় নি। ওরা চার প্রহর অতিক্রান্ত হবার পূর্বে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে না।

আয়োজনে কোন ত্রুটি হয় নি, সবই হিসাবমতো চলেছিল।

ত্রুটি ছিল বিচারবুদ্ধিতে। উনিও পরিণামের কথা চিন্তা করেন নি, সুগ্রীবকেও করতে দেন নি।

অথচ ওঁরা উভয়েই বালীকে সম্যক চিনতেন।

তারার অনুমানও অভ্রান্ত।

অবগুণ্ঠনবতী সামান্য দাসীর বহির্বাসে বল্কলের একটা আচ্ছাদন-মাত্রে সজ্জিতা তারা, সুগ্রীবের সম্মুখে অত রাত্রে অন্ধকার নিশীথে প্রেতিনীর মতো গিয়ে উপস্থিত হতে সুগ্রীব অবশ্যই চমকিত হয়েছিলেন, কিন্তু সে বহির্বাস উন্মোচন করে স্বমূর্তিতে প্রকাশিত হতে একেবারে হতচকিত বিহ্বল হয়ে গেলেন। হিংস্র জন্তুর আশঙ্কায় প্রতি রাত্রেই সুগ্রীবের পর্ণ কুটিরের সম্মুখে অগ্নি প্রজ্বলিত থাকে, অপরাহ্ণে যে প্রহরী আসে খাদ্য পানীয় নিয়ে, সে-ই সে অগ্নি জ্বেলে রেখে যায়, পাশে বিস্তর শুষ্ক কাষ্ঠ থাকে, সময়ে সময়ে স্তিমিতপ্রায় বহ্নিতে ইন্ধন দিয়ে পুনঃপ্রদীপ্ত করে নিতে হয়। সেইরূপ নব প্রজ্বলন্ত আলোকেই যে মূর্তি চোখে পড়ল, তা অন্ততঃ এখানে দ্বিপ্রহর রাত্রে এই ভয়াবহ পরিবেশে দেখার কথা কল্পনাও করেন নি।

এ যেন এক স্বপ্নদৃষ্টা দেবকন্যা, এই অপরূপ নারীমূর্তি। এ যেন পুষ্পদল দিয়ে গড়া, পীতাভ পদ্মদল দিয়ে কিংবা মধূৃথ নির্মিত দেবশিল্পীর ক্ষোদিত মূর্তি, মূর্তিও নয়, শিল্পীর মহত্তম কল্পনা মেঘ থেকে মূর্তি গ্রহণ করেছে। এ যেন কোন নারীর আগমন নয়—যেন দেবীরই আবির্ভাব। অগ্নির আলোক পর্যাপ্ত নয়, তাও কম্পমান—যেন এই বরনারীর আবির্ভাবেই সে কাষ্ঠের অগ্নিই উজ্জ্বলতর দীপ্ততর হয়ে উঠল, আর তাতেই যা দেখলেন, তাতে দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ রইল। চোখও ফেরাতে পারলেন না, কণ্ঠ ভেদ করে কোন স্বরও প্রকাশ পেল না।

এর পর আর সুগ্রীবের কি করার থাকতে পারে এই দেবীর আদেশ পালন করা ছাড়া! আদেশই—তারার অনুরোধ তাঁর কাছে অলঙ্ঘ্য আদেশ।

অবশ্য সেইদিন অপরাহ্ণে আরও একটি ঘটনা ঘটে গেছে।

বিস্ময়কর, ভীতিপদ।

সুগ্রীবের মনে হল, এই দেবকন্যার আবির্ভাব ও উক্ত ঘটনা দৈব-নির্দেশ, ভাগ্যের অঙ্গুলিসঙ্কেত।

সৌভাগ্য কখনও কখনও অযাচিতভাবে সম্মুখে আসে—প্রার্থিত বা

আকাঙ্ক্ষিত দুর্লভ বর নিয়ে, তখন তাকে প্রত্যাখ্যান করলে ভাগ্যদেবতা বিমুখ হন। সুযোগ বারবার আসে না জীবনে।

সে সময় অবিরাম প্রহরারত ক্লান্ত বিরক্ত উদ্বিগ্ন সুগ্রীব তাঁর অভ্যস্ত প্রস্তরখণ্ডের উপর বসে বোধ করি ঈষৎ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন।

অকস্মাৎ একটা পাশবিক, না পৈশাচিক চিৎকারে সে তন্দ্রার আলস্য বিদূরিত হল, নিমেষে গদা হস্তে উঠে দাঁড়ালেন।

উল্লাস নয়—বরং কতকটা আর্তনাদেব মতো। বিশাল কোন প্রাণীর মরণ আর্তনাদ?

সেই বিভীষিকাময় ধ্বনি, অমানুষিক একটা প্রচণ্ড শব্দ—মনে হল যেন চতুর্দিকের স্থিব বায়ুমণ্ডল, শূন্যতা ও পর্বতশিখরসমূহে প্রতিহত, প্রতিধ্বনিত হয়ে তাকে অধিকতর ভয়াবহ করে তুলল। শুধু অজানা কোন ভয় নয়—অশুভ কোন ঘটনার আভাস বলেই বোধ হল সেই অবর্ণনীয় কদয শব্দটা। কল্পনাতীত অভূতপূর্ব কোন অমঙ্গলের বার্তা বহন করে আনল—প্রলয়কালে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুভয়ার্ত বহু জীবের মিলিত আর্তনাদের মতো।

এমনিতেই সর্বাঙ্গ প্রস্তরবৎ অনড় ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাওয়ার কথা। সুগ্রীবও প্রস্তরীভূতই হয়ে গিয়েছিলেন কতকটা। কিছু করার শক্তি নেই, করণীয় কিছু আছে কিনা, তা চিন্তা করারও না।

শুধুই বিহ্বলভাবে শূন্য দৃষ্টিতে গুহামুখের দিকে তাকিয়েছিলেন, কারণ মনে হয়েছিল, শব্দটা ওর ভিতর থেকেই এসেছে। সেই জন্যই, গুহার বিশাল শূন্য গহ্বরে প্রতিধ্বনিত হওয়ার ফলেই তা এত তীব্র তীক্ষ্ণ ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। সেদিক থেকে চোখ ফেরাতেও সাহস হচ্ছিল না তাই। যদি কোন বিশাল প্রাণী এখনই ঐ স্থান থেকে এসে অতর্কিতে তাঁকে আক্রমণ করে!

অবশ্য তেমন কিছু ঘটে নি, তবে যা ঘটেছিল, তাও কম বিস্ময়-উদ্দীপক, কম ভীতি-সঞ্চারক নয়।

সেই বিকট আর্তনাদের প্রতিধ্বনি ভাল করে না মেলাতেই দেখা

গেল, সেই বিবরের মুখ থেকে প্রচুর রুধির নিঃসৃত হচ্ছে, প্রায় সদ্য জন্মলব্ধ নির্ঝরিণীর মতোই স্রোতধারা রচনা করে—এত প্রচুর রক্ত।

আবারও পাষাণে পরিণত হলেন সুগ্রীব।

এ কার রক্ত?

মানুষের, না কোন জন্তুর?

একই প্রাণী, না একাধিক?

কোন মানুষের হলে কার—বালীর না মায়াবীর?

কোন মানুষের দেহে এই পবিমাণ রক্ত থাকা সম্ভব?

এমনি নানা প্রশ্ন একই সঙ্গে মাথা তুলল মনের মধ্যে।

অবশ্য, পরক্ষণেই মনে হল, বালী বা মায়াবী কেউই সাধারণ মানুষ নয়। যেমন বিরাট তাঁদের শক্তি, তেমনই বিপুল দেহ। সে দেহে শোণিতের পরিমাণ কম থাকার কথা নয়।

আবার সন্দেহ দেখা দিল—প্রথম ভয়ার্ত বিস্ময়ের জড়তা কেটে গেছে ততক্ষণে—এ যা দেখছেন রক্তই তো, না অন্য কোন প্রকার রক্তবর্ণ তরল পদার্থ? রঙ্গীন জল? মায়াবীটা ইন্দ্রজালে পটু, ওঁকে প্রতারিত করারই কোন আয়োজন নয় তো এটা?

কথঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় করে এগিয়ে গিয়েছেন সুগ্রীব। স্পর্শও করেছেন।

তখনও উষ্ণ, শোণিত যে তাতেও সন্দেহ নেই।

তখন থেকেই এমনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে আছেন।

কী করবেন, কী করা উচিত? আরও বহু লোক ডেকে এনে, সকলে মিলে ভিতরে প্রবেশ করবেন? না, আরও কিছুদিন অপেক্ষা করবেন?

এমনি নানা পরস্পর-বিরোধী চিন্তা তাঁর বুদ্ধিকে যেন আচ্ছন্ন করে দিয়েছে, কিছু ভাল করে ভাবতেও পারছেন না।

রাত্রি প্রভাতে কোন প্রহরী বা দাস আসবে খাদ্য, বস্ত্র, পানীয় নিয়ে। অন্য কোন প্রয়োজন বা আদেশ থাকলে—তাও জানতে।

তাকে দিয়ে অবশ্যই রাজ্য-প্রধানদের ডেকে পাঠাবেন। তারাও তখনই আসবে।

কিন্তু তার পর ?

ঐ বিপুল রহস্যময় অন্ধকার—হয়ত বা নানা প্রাণঘাতী বিপদের জাল বিস্তার করা—হয়ত ওর মধ্যে অসংখ্য অন্তহীন শাখাপথে মৃত্যুর নানাবিধ উপায় সজ্জিত রেখেছে দানবটা।

গুহামুখ সংকীর্ণ, ভিতরেও যতদূর দৃষ্টি চলে, অনুচ্চ অপ্রশস্ত পথ, একসঙ্গে বহু ব্যক্তি দূরের কথা, দুই ব্যক্তির পাশাপাশি চলাও অসম্ভব। একে একে প্রবেশ কবলে, কিছুদূব যাওয়ার পব যদি একে একেই হত্যা কবতে থাকে ? কে জানে, মায়াবী তাব কিছু অনুচব বা সহচব রেখেছে কিনা, কিংবা কিছু হিংস্র পশুদের অভুক্ত রেখে ক্রুদ্ধ ও হিংস্রতর করে বেখেছে—এঁদের কিছু লোক ভিতরে প্রবেশ করলে, সেই প্রায়-উন্মত্ত শ্বাপদদের বন্ধনমুক্ত করবে, তারাও ক্ষুধার তাড়নায় নিমেষে এদের নিঃশেষ করবে।

এইসবই চিন্তা করছেন, অবিরাম নিজের প্রস্তাব নিজেই বিরুদ্ধ যুক্তির দ্বাবা খণ্ডন করছেন—এমন সময়, যেন এই ছায়া থেকে কায়া গ্রহণ করা অপরূপা ছায়ারূপিণী, যেন চাবিদিকের খণ্ড মেঘাচ্ছন্ন জ্যোৎস্না থেকে মূর্তি পরিগ্রহ করে এক দেবীমূর্তির আবির্ভাব ঘটল।

অতঃপর সুগ্রীবের যদি মনে হয়, তাঁর এই জীবনমরণসমস্যার সমাধান করতে, তাঁর বর্তমান-ভবিষ্যতের সংখ্যাহীন গুরুতর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে স্বয়ং বিধাতা পরিচিত নারীমূর্তিরূপে জনৈকা দেবদূতীকেই পাঠিয়েছেন—খুব দোষ দেওয়া যায় না।

এবং সত্যই সেই দেবদূতী বা দেবীর মতোই তারা এইসব সমস্যা-জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করে দিলেনও তো !

তারা জানতেন—তিনি বৃথাই এতকাল রাজকার্যের মধ্যে বাস করেন নি, রাজার প্রধানা ঘরণীরূপে—মানুষ যখন কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে ব্যাকুলভাবে তার সমাধানের উপায় খোঁজে, তখন সম্ভাব্য

সব উপায় তাব মস্তিষ্কেই দেখা দেয়, নিজেই আবার সে পথের অন্ধকার দিক, বিপজ্জনক দিকের কথা চিন্তা করে হতাশ হয়ে পড়ে, অন্য উপায় অবলম্বনেব চেষ্টা করে। ঘটনার যে পরিণাম তার পক্ষে লাভজনক, সেই দিকেই মন ঝোঁকে, কিন্তু সে পথে যেতে সাহসে কুলোয় না, চক্ষুলজ্জা বা বিবেকও বাধা দেয়। এইভাবে নিজেই বৃহত্তর জটিলতার সৃষ্টি করে।

সেই সময় অপব কেউ যদি কণ্ঠস্ববে অতিবিক্ত দৃঢ়তা এনে কোন একটি বিশেষ উপায়েব ওপব জোর দেয়, সমস্যার্ত মানুষটির সুবিধাজনক হলে তো কথাই নেই, তখন বিহ্বল বিমূঢ় ব্যক্তিটি সেই পথই গ্রহণ করে, নিশ্চিন্ত হয়। ভাবে, এর দায়িত্বটা ঐ বক্তার উপরই ন্যস্ত করল সে। এমন কথা ভাবে না বা ভাবতে চায় না যে আসল দায়িত্বটা তাবই থেকে গেল।

তাবা এসব মানব-মনোধর্ম অবগত ছিলেন, সুগ্রীবের মনোভাবও।

আরও নিকটে এসে নিজেব অঞ্চলে ওঁর ললাটের ঘর্ম মুছে নিয়ে, ওঁর স্কন্ধে সমস্ত ভাব ন্যস্ত করে যেন এলিয়ে পড়ে মৃদু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'এ বালীরই বক্ত, তুমি যা দেখেছ। যদি মায়াবীর হত, এতক্ষণে দুই প্রহর প্রায় অতীত হয়ে গেল, বিজয়ী বালী কি গুহা থেকে বেরিয়ে আসতেন না? শব্দের উৎপত্তি-স্থান নিকটবর্তী না হলে এত উচ্চ ও বিকট শোনাত না। যারই মরণ আর্তনাদ হোক—সে মৃত্যু নিকটেই কোথাও ঘটেছে। মহাবল বালীই নিহত হয়েছেন। পাপিষ্ঠ মায়াবী তোমার কাছে লাঞ্ছিত হবার আশঙ্কায় আত্মপ্রকাশ করতে সাহস করছে না। অথবা, অপেক্ষা করছে, তোমরা বালীর দেহ উদ্ধারের জন্য একে-একে ভিতরে প্রবেশ করলে, সেও একে একে তোমাদের বধ করবে। ও চেষ্টাতে প্রয়োজন নেই, বরং রাত্রি প্রভাতে কিছু শ্রমিক বা সৈনিক ডেকে গুহামুখ ভাল করে বন্ধ করে দাও 'পাপিষ্ঠটা অনাহারে মরুক।'

তারপর সুগ্রীবের ঊর্ধ্বোত্থিত গ্রীবা ধরে তাঁর দৃষ্টিতে নিজের স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যেন ধীরে ধীরে, শুধু শ্রুতিগম্য নয়—বিশেষ অর্থবহু-

বক্তব্যকে বুদ্ধিগম্য করে বললেন, 'দেখে, বিবেচনার দ্বারা নির্বাচন করে, বিশাল ও গুরুভার প্রস্তরখণ্ড এনে গুহামুখের সম্মুখে এক কৃত্রিম ক্ষুদ্র পর্বত রচনা করাই শ্রেয়ঃ—যাতে মায়াবীটা, কোনোমতেই না তা সরিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে। সেও কম বলশালী নয়, সেই বুঝে গুহামুখ বন্ধ করবার ব্যবস্থা করো।'

বিশেষ ব্যক্তির মোহময় দৃষ্টির বিশেষ চাহনি ও কণ্ঠস্বরের বিশেষ বক্রতার সম্যক অর্থ অবশ্যই যথাস্থানে পৌঁছেছিল, নচেৎ আবারও প্রায় এক লহমার মধ্যে সুগ্রীবের ললাট স্বেদার্দ্র হয়ে উঠবে কেন, তাঁর দৃষ্টিই বা অমন করুণ অসহায় দেখাবে কেন?

এটা সাধারণ চিত্তদৌর্বল্য বা বিবেকের পীড়া—তা বুঝতে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী তারার বিলম্ব হল না। তেমনি সুগ্রীবের বৃহত্তর দুর্বলতা কোথায় তাও জানা ছিল। তিনি এক মদির কটাক্ষ নিক্ষেপ করে, আবারও অঞ্চলপ্রান্ত দিয়ে সদ্য-প্রকাশিত স্বেদ মোচন করে, খুব লঘুভাবে সেই তখনও-আর্দ্র ললাটে একটি চুম্বন করে—প্রায় চোখের পলকেই আবার দাসীর বহির্বাস তুলে নিয়ে ত্বরিত গতিতে অদৃশ্য হলেন।

বনস্থলীর অস্পষ্ট আলোক ও নিবিড় ছায়া থেকে পরিগৃহীত মূর্তি পুনশ্চ যেন ছায়াতেই মিলিয়ে গেল।

॥ চার ॥

প্রথমটা অস্বস্তি বোধ করলেও সুগ্রীব শেষ অবধি তারার প্রতি কৃতজ্ঞতাই অনুভব করেছিলেন। তাঁর উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হতেও কোন বাধা হয় নি। মায়াবীর পুনরাগমনের সম্ভাবনা উল্লেখ করা মাত্র শঙ্কিত অমাত্যের দল প্রস্তর-স্তূপ রচনার প্রস্তাবেই পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন এবং বহু শ্রমিক নিয়োগে দূর দূরান্ত থেকে বিশাল বিশাল প্রস্তর খণ্ড আনয়নেও ত্রুটি ঘটে নি।

পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহও তারার অনুমান-অনুযায়ীই চলছিল। ঠিক

অভিষিক্ত না হলেও সুগ্রীবই শাসকের পদ গ্রহণ করেছিলেন এবং তৎকালীন রীতি অনুযায়ী পদাধিকার-বলে পূর্ব শাসকের রমণীগুলিও। আর তার মধ্যে তারাই যে অগ্রগণ্যা হয়ে উঠবেন, সে বিষয়েই বা সন্দেহ কি ! বালীর প্রতি সম্মান ও তারার প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপনের জন্যই তো তাঁকে অগ্রাধিকার দেওয়া কর্তব্য।

এতদিনের কামনা কল্পনা পূর্ণ হয়েছে, সকল দিকেই শান্তি। সুগ্রীব মুখে কিছু না বললেও তাঁর আচরণ ও দৃষ্টিতে প্রেম ও কৃতজ্ঞতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তারা নিজের বুদ্ধির প্রশংসা করছেন মনে মনে—এমন সময় যেন এক মহাপ্রলয় ঘটে গেল তাঁদের জীবনের উপর দিয়ে।

অকস্মাৎ জীবিত ও সুস্থ বালী সেই পর্বত-সদৃশ প্রস্তর বাধা অপসারিত করে নিজের রাজ্য ও রাজধানীতে এসে উপস্থিত হলেন।

অতঃপর সিংহাসন ও তাঁর রমণীগুলিকে সুগ্রীবের কুক্ষিগত দেখে স্বভাব-কোপন বালীর মুখভাব যে খুব প্রসন্ন বা উদার দেখাবে না—তা সহজেই অনুমেয়।

তাঁর সেই ভয়ঙ্কর মুখ-চোখের ভাব দেখে রাজ্য-প্রধানদেরও বক্ষে শঙ্কা জাগল। এবং সে শঙ্কার সঙ্গত কারণও ছিল।

এটাকে যদি বালী বিশ্বাসঘাতকতা ও তাঁকে অপসারণের ষড়যন্ত্র বলে মনে করেন তো তাঁকে খুব দোষ দেওয়াও যায় না।

কিন্তু রাজ্যপ্রধান বা মন্ত্রীগণ কেবলমাত্র আশঙ্কায় নয়—অপরিমাণ বিস্ময়েও বিহ্বল ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন।

এবং প্রত্যক্ষ প্রাণভয়ও তাঁদের সে বিহ্বলতা অপনোদন ক'রে আশু কোন প্রতিকারে প্রণোদিত করতে পারল না।

বিস্ময়। বিস্ময়। বিস্ময় আর অবিশ্বাস।

নিজেদের দৃষ্টিকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না।

দানবরাই ইন্দ্রজালে পটু ও পারদর্শী এই তাঁরা জানতেন। বালী কি তাদের অপেক্ষাও মায়াধর ?

না কি এ বালীর প্রেতাত্মা !

অথচ বালী-মায়াবী সংঘষর ও বালীর পুনরুজ্জীবনের ইতিহাস খুব সবল ও সংক্ষিপ্ত।

মায়াবী গুহার ভিতবকার জায়গা ও গুপ্ত পথের জটিলতার উপর নির্ভর করেই নিশ্চিন্ত হয় নি, কিছু কিছু বিশ্বস্ত ও বলশালী দানবও পূর্ব হতে প্রস্তুত রেখেছিল। তারা সাগ্রহেই এসেছে—কারণ বালী জীবিত থাকতে তাদের শ্রেয়ঃ নেই তা তারা জানত।

প্রথম যুদ্ধে তাদেব কয়েকজনকে সাংঘাতিক প্রহারে প্রায় মুমূর্ষু করে ফেলাতে তারা ওঁর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধের আশা পরিত্যাগ করে গুহার মধ্যে বালীকে পথভ্রষ্ট করিয়ে অনাহারে মারবে—এই আশার উপর ভরসা করেছিল। বলের থেকে কৌশল বেশী কার্যকর হবে—এই রকমই ভেবেছিল।

কিন্তু বালী দৈবক্রমে প্রথম দিকেই ওদেব খাদ্যভাণ্ডারে গিয়ে পড়েছিলেন। হয়ত এ ব্যবস্থা অন্য অন্য স্থানেও কিছু কিছু ছিল। নতুবা দানববাই বা এতকাল, এক বর্ষেরও অধিক, এখন যা শুনছেন—জীবিত থাকবে কি ভাবে? কিন্তু সঞ্চয়ের বিপুলতা দেখে বুঝেছিলেন ঐ ভাণ্ডারটিই প্রধান। তিনি নিজে ওদের অনুসন্ধানের চেষ্টা না করে সেই ভাণ্ডাবেব প্রবেশ-পথেই অপেক্ষা করতে লাগলেন।

সেখানে সূচীভেদ্য অন্ধকাব। দিনও নেই, রাত্রিও নেই, আছে অন্তহীন প্রতীক্ষা। সময়ের হিসাব রাখা সম্ভব নয়, কতকাল কেটেছে তাও বুঝতে পারেন নি। এমন কি কোন্ দিক থেকে এসেছেন, সেদিকে যেতে গেলে কোন্ দিকে মুখ করে যেতে হবে, ক্রমে তাও ধারণার অতীত হয়ে গেল।

আহার্যের ঘ্রাণে দিক নির্ণয় করে ভাণ্ডারের মধ্যে এসে পড়েছিলেন হাত দিয়ে দিয়ে অনুভব করে সেগুলির অস্তিত্ব, বিপুলতা ও স্থিতিস্থান বুঝেছিলেন। কিছুদূরে ক্ষীণ জলধারা পতনের শব্দে নির্ঝরিণীর অস্তিত্ব জেনে সেখানে গিয়ে জল পান করতেন, কখনও কখনও স্নানের চেষ্টাও করেছেন। ক্রমে ক্রমে অন্ধকারে দৃষ্টি অভ্যস্ত হতে ভাণ্ডারের মুখ পর্যন্ত

যেতে পারতেন, সেখান থেকে প্রধান পথের একটা দিক নির্ণয়ও হত।

মায়াবী তাঁকে সে স্থান থেকে অন্যত্র নিয়ে যাবার বহু চেষ্টা করেছে, নানাবিধ ছলনার আশ্রয় নিয়েছে। এমন কি সুগ্রীবের কণ্ঠস্বর অনুকরণ করে করুণ আর্তনাদ করেছে—কিন্তু বালী এই ধরনের ছলনার জন্য প্রস্তুতই ছিলেন বলে প্রতারিত হন নি।

অবশেষে, সম্ভবতঃ উপবাসের জ্বালা সহ্য করতে না পেরেই মায়াবী সদলবলে সেই ভাণ্ডার দ্বারে হানা দেয়। সুগ্রীব যে বিকট শব্দ শুনেছেন তা মায়াবীরই মরণ-আর্তনাদ। মায়াবীর দেহ বিশাল, তার কণ্ঠস্বরও তেমনি কর্কশ ও উচ্চগ্রামের, তাতেই এই ধরনের শব্দ হয়েছে। রুধিরও সেই দানবটারই।

কিন্তু তাকে বধ করেই অব্যাহতি পান নি বালী। অবশিষ্ট যে কয়েকজন পাপ-সহচর ছিল দুর্বৃত্তটার তারা একাধারে ক্রুদ্ধ ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে, ওঁকে ঘিরে ধরেছে। অন্ধকার সঙ্কীর্ণ গুহাপথে এতগুলি লোকের সঙ্গে মাত্র বাহুবলে যুদ্ধ করা শুধু অসম নয়, অসুবিধাজনকও, তারা মায়াকৌশল বা ছলনায় সিদ্ধহস্ত, সেভাবে বালীকে বিপন্ন করার অনেক চেষ্টা করেছে—সেই জন্যই আরও কয়েকদিন বিলম্ব হয়েছে তাঁর —সম্ভবতঃ তাদের সব কজনকেই বধ করতে। আর কেউ আছে কিনা তিনি জানেন না, থাকলেও সে প্রাণ-ভয়ে কোথাও আত্মগোপন করে আছে।

অবশেষে—অনেকখানি নিরাপদ হবার পর গুহামুখের আলোক দেখে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার চেষ্টা করবেন, সে আলোকের কোন চিহ্ন কোথাও দেখতে পান নি। এতদিন অন্ধকারে থেকে দিনের সমস্ত স্মৃতি মন থেকে মুছে গিয়েছে। তাঁকে ঐ গলিত শবদেহের মধ্যেই পড়ে একদা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হত—যদি না শেষ অবধি দৈব কৃপা করতেন। ওঁর হস্তে নিগৃহীত দানবদের মধ্যে একজনের তখনও প্রাণ ছিল, সে কোন মতে বুকে ভর দিয়েই নিঃশব্দে গুহামুখের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছিল, তবু সেই বদ্ধস্থানে অখণ্ড নিস্তব্ধতার মধ্যে শূন্যে কোন বস্তু

আন্দোলনেরও শব্দ ওঠে একপ্রকার। বালী ওর গতির শব্দ পাবেন বৈকি! বালীর মনে হল তার তখনও দিক সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা আছে। ওকে অনুসরণ করাই শ্রেয়ঃ।

এও দৈবকৃপা। বালীর মনে ও মস্তিষ্কে ক্রোধেরই প্রাধান্য সমধিক। উন্মত্ত ক্রোধ। কিন্তু কে জানে কেন, বোধ করি শোচনীয় মৃত্যু অদৃষ্টে নেই বলেই সেই চরম আপৎকালে, শোচনীয় মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে তিনি সহজাত ক্রোধ, জিঘাংসাবৃত্তি বা প্রতিশোধ-স্পৃহাকে জয় করতে পেরেছিলেন। ক্রোধের উপর বিবেচনার জয় হয়েছিল। তিনি এটুকু ঠিকই বুঝেছিলেন, এই অর্ধজীবিত লোকটির গতি লক্ষ্য করাই তাঁর নিজের প্রাণরক্ষা করার তখন একমাত্র উপায়।

সেও কঠিন, কারণ লোকটা সরীসৃপের মতোই অগ্রসর হচ্ছে, যতটা সম্ভব নিঃশব্দে, তারই সামান্য যেটুকু ধ্বনি উঠছে, বিশেষ নিঃশ্বাসের— তারই উপর নির্ভর, বরং বলা উচিত অনুমানের উপর নির্ভর, তবু সে মসীকৃষ্ণ অন্ধকারে সেইটুকুই প্রাণরক্ষার একমাত্র অবলম্বন—এবং তার সাহায্যেই শেষ পর্যন্ত গুহামুখে এসে পৌঁছেছিলেন।

অর্থাৎ সে লোকটি থেমে ছিল। কিন্তু এই কি গুহার দ্বার, তাহলে বিন্দুমাত্র আলোক নেই কেন? লোকটাই কি তার পথ ভুল করল?

প্রথমে সেই সংশয় আর তজ্জনিত হতাশাই প্রবল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পরে ঐ দানবটা তার প্রচুর রক্তক্ষরণজনিত দুর্বলতার মধ্যেই প্রাণপণে প্রস্তর অপসারণের চেষ্টা করছে দেখে শেষ অবধি সত্যটা তাঁর মনে প্রতিভাত হয়েছিল।

নিশ্চয় তাঁকে মৃত মনে করে ওরা গুহার মুখ বন্ধ করে চলে গেছে, তাতেই এমন নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

সে দানব পারে নি ঐ জগদ্দল প্রস্তরস্তূপ ঠেলে বেরিয়ে আসতে— কিন্তু বালী পেরেছিলেন। বালীর অপরিসীম দৈহিক শক্তির পরিচয় বহু দূরদেশের বহু ব্যক্তিই পেয়েছে। সে পরিচয়ের কিছু কিছু

কাহিনী জনশ্রুতি বা প্রবাদে পরিণত হয়েছে। এ কথাও কেউ কেউ বলেন, স্বয়ং সূর্যের সঙ্গে স্পর্ধা প্রকাশ করতে গিয়েছিলেন বালী।

তাও, বালীও—বহুক্ষণের, সম্ভবতঃ কয়েক প্রহরের বা কয়েক দিনের চেষ্টাতে ঠিক জানেন না, সময়ের কোন হিসাবই ছিল না, শেষ পর্যন্ত ঐ বিশাল পাষাণ প্রাচীর সরাতে পেরেছেন। অর্থাৎ বালীর পক্ষেও খুব সহজ হয় নি কাজটা।

প্রায়-নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে দৈবক্রমে ফিরে এসে সে বিপদের যারা কারণ তাদের সম্বন্ধে মনোভাব মধুর থাকবে—তা সম্ভব নয়।

বালীকে অগ্নিশর্মা মূর্তিতে উপস্থিত হতে দেখেই সুগ্রীব ও অমাত্যগণ, রাজ্য-প্রধানরা আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে গিয়েছিলেন।

এটা যে কেউ ইচ্ছা করে করে নি, বালী মৃত বুঝেই এ কাজ করেছে—করতে হয়েছে—এ কথা বালীকে কিছুতেই বোঝানো যাবে না। তিনি পূর্বেই যথেষ্ট ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। এখন রাজধানীতে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে দেখলেন যে তাঁর সিংহাসন এবং রমণীগুলি পর্যন্ত গ্রহণ করে সুগ্রীব সুখে ও নিশ্চিন্তে রাজত্ব করছেন—সঙ্গে সঙ্গে সে ক্রোধাগ্নি প্রায় দাবানলে পরিণত হল। তিনি পুনঃ পুনঃ গর্জন বা সিংহনাদ সহকারে সব কয়জনকে শোচনীয়ভাবে বধ করার সঙ্কল্প প্রকাশ করতে লাগলেন।

সুগ্রীব পাংশু বিবর্ণ মুখে কম্পিত দেহে এসে তাঁর রাজমুকুট উন্মোচিত করে বালীর পদতলে রক্ষা করে করুণ কণ্ঠে বললেন, 'আমি ভুল বুঝেই এ কাজ করেছি। নচেৎ পূর্বেও যেমন আপনার দাসানুদাস ছিলাম, এখনও তাই আছি। আপনার স্থান আপনি অধিকার করুন। আমাকে আদেশ করুন, কোন্ কার্য সাধন করলে আপনার প্রসন্নতা ও ক্ষমা লাভ করতে পারি?'

তিনি আরও বললেন, 'আমার একার বুদ্ধিতে এ কার্য করি নি, উপস্থিত অমাত্যগণ ও প্রধান ব্যক্তিরা সকলেই এই পরামর্শ দিয়েছেন। আমার তখন একান্ত বিহ্বল অবস্থা, নিজে বিচার করে দেখে মনস্থির

করব—সে অবস্থা ছিল না।'

বালী সে কথায় কর্ণপাত মাত্র করলেন বলে মনে হ'ল না। বরং সবল পদাঘাতে সুগ্রীবকে বহু দূরে নিক্ষেপ ক'রে—মহামাত্য জাম্ববান, মৈন্দ, দ্বিবিধ, গয়, গবাক্ষ, শরভ, বিদ্যুন্মালী, সম্পতি, হনুমান, সূর্যাক্ষ, সুবাহু, নল, কুমুদ, সুষেণ, তার, দধিবক্র, নীল, সুনেত্র প্রভৃতি রাজ্য-প্রধানদের সম্বোধন ক'রে বললেন, 'তোমাদের হীন ষড়যন্ত্রে ও স্বার্থ-বুদ্ধিতেই এ কার্য হয়েছে, তা আমি বিলক্ষণ বুঝেছি। আমাকে ঐ অন্ধ গুহার মধ্যে আবদ্ধ রেখে আমার জীবন নষ্ট করার সুবিধা হবে বলেই এই ষড়যন্ত্র। তবে আমিও বালী, ক্ষমা আমি কাকেও করি না, করবও না। এখন সর্বাগ্রে আমার বিশ্রাম প্রয়োজন। তারপর চিন্তা করব—কোন্ প্রকার শাস্তি দিলে তোমাদের পাপের উপযুক্ত দণ্ডদান করা হয়। যাও দূর হয়ে যাও আমার সম্মুখ থেকে। তবে মনে ক'রো না যে পলায়ন ক'রে বেশী দূর যেতে পারবে। যেখানেই যাও—আমার আয়ত্তের বাইরে যেতে পারবে না, আমার রোষবহ্নি থেকে নিস্তার পাবে না। উত্তরে কৈলাস, দক্ষিণে মলয় পর্বত—যেখানেই থাকো—আমার এই দুই হস্ত তোমাদের পেষণ ক'রে পিণ্ডে পরিণত করবে।'

তারপর পদানত প্রাণভয়-বিবর্ণ সুগ্রীবের দিকে সঘৃণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, 'তুইও অব্যাহতি পাবি না। তোকে প্রাণে মারব না—কারণ, যদিচ আমরা এক পিতার সন্তান নই, তবু এক মাতার গর্ভে তো জন্ম-গ্রহণ করেছি, সহোদর—তবে তোর হস্তপদ নষ্ট ক'রে চিরদিনের মতো বিকলাঙ্গ ক'রে দেব, যাতে আর কোনদিন সিংহাসনে বসার আশা না থাকে সে অভিলাষ চিরদিনের মতো দূর করতে যাতে বাধ্য হোস!'

এই পর্যন্ত বলে আর একটা হুঙ্কার দিয়ে বালী বেপথুমানা, ত্রস্তা, ক্রন্দনরতা ভ্রাতৃজায়া রুমাকে বাহুবন্ধনে বদ্ধ ক'রে নিজের বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করলেন—বোধ করি ভ্রাতাকে অধিকতর মনোকষ্ট দেবার জন্যই। অথবা রুমার সম্বন্ধে লালসা ছিলই, এতকাল চক্ষুলজ্জাতেই তাকে গ্রহণ করতে পারেন নি। এখন আর সে বাধা রইল না।

এই তাৎকালিক সঙ্গিনী নির্বাচন সম্ভবতঃ সুগ্রীবের প্রতি বিধাতারই করুণা।

কারণ বুদ্ধিরূপিনী, মনোবল-প্রদায়িনী, মিষ্ট- অথচ তীক্ষ্ণ-ভাষিণী তারাদেবীকে বালীর সেবায় বিব্রত থাকতে হ'ল না। তিনি স্বচ্ছন্দে এঁদের ভাগ্যরশ্মি নিজ হস্তে ধারণ করতে পারলেন।

ভয়ার্ত বানর রাজপুরুষ ও অমাত্যগণ অনেকেই পলায়নে তৎপর হয়েছেন ততক্ষণে। জাম্ববান নল প্রভৃতি প্রাজ্ঞ ও সুবুদ্ধি প্রধানরা তাঁদের বোঝাতে চেষ্টা করছেন যে মহাবল বালীর যে শক্তি ও প্রকৃতি, তাতে কোথাও গিয়ে নিস্তার পাওয়া যাবে না। আর, দুই তিন প্রহর —ওঁর ক্লান্তি অপনোদনের পক্ষে সেইটুকুই যথেষ্ট—সময়ের মধ্যে তাঁরা কত দূরই বা যেতে পারবেন? তার চেয়ে একবার সকলে মিলিতভাবে ওঁকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করলে কি হয়? সকলে এক যোগে আক্রমণ করলে, যত বড় বীরই হোন বালী, কতক্ষণ সহ্য করতে পারবেন?

হয়ত এ যুক্তিতে এঁরা কিছুটা আশ্বস্ত হতে পারতেন কিন্তু বিজ্ঞ হনুমান স্মরণ করিয়ে দিলেন, দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের রীতি অনুসারে এমনভাবে আক্রমণকে কাপুরুষোচিত কর্ম বলে বিবেচনা করা হয়। এ নিষাদের কার্য। এভাবে জয়লাভ করলে তাঁরা ভদ্র অনার্য সমাজে নিন্দিত হবেন, তাঁদের সকলে বর্বর বলবে। এমন কি এ কার্য দানব বা রাক্ষসরাও বোধ করি করে না।

আবার এক মূঢ় বিহ্বলতায় সকলে পাষাণবৎ নিশ্চল হয়ে গেলেন।

আর ঠিক এই সঙ্কটক্ষণে এগিয়ে এলেন তারাদেবী।

হাত ধরে সুগ্রীবকে ভূমিশয্যা থেকে তুলে নিজের অঞ্চলে তাঁর কালভয়জনিত ঘর্মবারি ও ধূলা মোচন ক'রে নিয়ে বললেন, 'আপনারা এখনই— যতদূর সম্ভব দ্রুত ঋষ্যমূক পর্বতে চলে যান। নারী ও শিশুদের নিয়ে যাবার চেষ্টা করবেন না, কারও সঙ্গে আলোচনা ক'রেও বৃথা কাল-

ক্ষেপ বা অধিকতর জটিলতার সৃষ্টি করবেন না। গৃহসামগ্রী নিয়ে যেতে গেলেও যে ঈষৎ আলোড়ন উঠবে—একেবারে নিঃশব্দে এ কার্য হয় না—তা মহাবল বালীর কর্ণে পৌঁছতে পারে। তাহলে আসন্ন সর্বনাশ প্রত্যক্ষ হয়ে পড়বে। যেমন আছেন, যে যেভাবে আছেন, এখনই দ্রুত ঐ পর্বত অভিমুখে যাত্রা করুন। প্রাণভয়ে অবশ্যই পদক্ষেপ ত্বরান্বিত হবে, আপনারা দুই প্রহরকালের মধ্যেই ঋষ্যমূকের সানুদেশে পৌঁছে যাবেন। অতঃপর আর কোন ভয় থাকবে না।'

সুগ্রীব নির্বোধের মতো শূন্য দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ এই আশ্চর্য নারীর মুখেব দিকে তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করলেন, 'তার অর্থ ?'

শিশুদের নির্বুদ্ধিতা দেখলে অভিভাবকরা যেমন প্রশ্রয়ের হাস্য করেন—তারাদেবী সেইভাবেই হাসলেন। বললেন, 'তোমাদের স্মৃতিশক্তি দেখছি বড়ই দুবল।'

সুগ্রীবকে যেন উপেক্ষা ক'রেই হনুমানের দিকে ফিরে বললেন, 'আপনার নিশ্চয় স্মরণ আছে ?'

হনুমান তারাকে অভিবাদন ক'রে বললেন, 'আছে বৈকি দেবী। ওখানেই পূর্বে মতঙ্গ মুনির আশ্রম ছিল। কিছুদিন পূর্বে অকস্মাৎ পুরাকালের পর্বত-সদৃশ অতিকায় এক মহিষ কোন অজ্ঞাত কারণে প্রাচীন দুষ্প্রবেশ্য অরণ্যভূমি থেকে লোকালয়ে এসে পড়ে। যেন সাক্ষাৎ-কৃতান্ত-রূপী এই অসুর চতুর্দিকে নিজের যুদ্ধ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার মতো কোন যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজে বেড়াতে লাগল। কিন্তু কেউই তাকে নিবারণ বা দমন করতে সাহস করল না। অবশেষে বোধ করি সেই ভীষাণাকার জন্তুটার মৃত্যুই আসন্ন হয়ে থাকবে—একদা কিষ্কিন্ধ্যাধীশ্বর বালীর এই প্রাসাদসম্মুখে এসে তর্জন-গর্জন ও নানা উৎপাত শুরু ক'রে দিল। শক্তি-অভিমানী বালী অবশ্যই এ স্পর্ধা সহ্য করবেন না—তিনি মহা ক্রুদ্ধ হয়ে তার দর্প চূর্ণ করার উদ্দেশ্যে তখনই প্রাসাদ থেকে বহির্গত হলেন।

'এর পর যে ঘোর যুদ্ধ হ'ল, তা বর্ণনা করাও কঠিন। মনে হ'ল, প্রলয় আসন্ন। বালীর মতো মহাবল পুরুষকেও বিলক্ষণ বেগ পেতে

হয়েছিল তাকে নির্বীর্য করতে। তথাপি সে শেষ পর্যন্ত এক সময়ে অবসন্ন হয়ে পড়ল। তখন তাকে যথেচ্ছ প্রহারে বধ ক'রে বালী—যেন নিজের অপরিমেয় শক্তি পরীক্ষা করতেই—সেই পর্বত-সদৃশ পাষাণভার পশুটাকে দুই শৃঙ্গে ধরে বহুদূরে নিক্ষেপ করলেন। বালীর অবিশ্বাস্য শক্তির প্রমাণস্বরূপ সে শব ঐ মতঙ্গ মুনির আশ্রমের কিছু দূরে গিয়ে পতিত হ'ল।

'কিন্তু গগনপথে থাকতেই ক্ষতবিক্ষত দেহটা থেকে কয়েক বিন্দু শোণিত ঐ আশ্রমে পড়ে—এবং মুনির দেহেও। তাতেই ক্রুদ্ধ মুনি অভিসম্পাত দেন—যে ব্যক্তি এভাবে তাঁর আশ্রম অপবিত্র করল, সে কখনও এই আশ্রমের চতুঃসীমার মধ্যে আসতে পারবে না। এলেই অনিবার্যভাবে তার মৃত্যু ঘটবে।

'সে সংবাদ অবশ্যই বালীর কর্ণে পৌঁছবে, এ তো অবধারিত সত্য। বালা দূর থেকে তাঁর ক্রোধ সংবরণ ও অভিশাপ প্রত্যাহারের জন্য যথেষ্ট অনুনয় বিনয় করেছিলেন, এ কার্য যে ইচ্ছাকৃত নয়. এর ভূরি ভূরি প্রমাণ উপস্থাপনের চেষ্টাও—কিন্তু মতঙ্গকে প্রসন্ন করতে পাবেন নি। তখন থেকেই এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর মধ্যে ঐ ঋষ্যমূক পর্বত ও তার সংলগ্ন বনস্থলীটুকু মহাবলদর্পী বালীর কাছেও অগম্য হয়ে আছে।'

এই বলে, নিমেষ-কয়েক কাল নীরব থেকে মহাবীর হনুমান সপ্রশংস দৃষ্টি তারাদেবীর প্রতি নিবদ্ধ ক'রে বললেন, 'দেবীর স্মৃতিশক্তিই শুধু বিস্ময়কর নয়, প্রত্যক্ষ এবং ভয়াবহ মৃত্যুর সম্মুখেও যে সে শক্তি কাযকরী থাকে, এমন দ্রুত সেই ভয়ানক বিপদ থেকে অব্যাহতি পাবার উপায় বলে দিতে পারেন—সেই অবিশ্বাস্য স্থিরবুদ্ধিই সর্বাপেক্ষা প্রশংসার্হ এবং অধিকতর বিস্ময়কর।'

মহাবীর ব্যতীত অবশিষ্ট রাজ্যপ্রধানগণ অবশ্যই তারাদেবীর সদা-জাগ্রত উপস্থিত বুদ্ধি এবং আশ্চর্য স্মৃতিশক্তির প্রশংসা করার জন্য সময়ক্ষেপ করেন নি, তাঁরা ততক্ষণে, সেই অবস্থাতেই, পুত্র-কলত্র অথবা সঙ্গিনীগণের জন্য কিছুমাত্র চিন্তা না ক'রে, যতটা সম্ভব পদক্ষেপণ-শব্দকে

সংযত রেখে—ঋষ্যমূক অভিমুখে দ্রুত পদচালনা আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন। যতটা অল্প সময়ে বালীর থেকে যত অধিক দূরত্ব সৃষ্টি করা যায়—সেইটাই তাঁদের অগ্রগণ্য চিন্তা।

হনুমানের জন্য চিন্তা নেই, তাঁর শশকসম দ্রুতগতি এবং শাখামৃগদের ন্যায় উল্লম্ফন-ক্ষমতা সর্বজনবিদিত।

তিনি অনেক পরে যাত্রা করলেও ওঁদের পূর্বে ঋষ্যমূক পৌঁছে যাবেন।···

আর সুগ্রীব যে তখনও দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় সেখানেই আছেন—সে জন্যও তাঁদের বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই। সুগ্রীবই কি তাঁদের এই ভয়ঙ্কর বিপদের কারণ নন?

ওঁরাই যে সুগ্রীবকে এই কর্মে উৎসাহিত এবং বস্তুতঃ প্রণোদিতই করেছিলেন সেদিন—সে কথা স্মরণ রাখা সম্ভব নয়, এ অবস্থায় কেউ রাখেও না।

সুগ্রীবের ইতস্ততঃ করার কারণ আর যাই হোক—ভ্রাতৃপ্রেম নয়।

তিনি তারার মুখের দিকে সকাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, 'তুমিও চলো।'

'না', তারা দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'আমি দস্যু-তস্করের মতো পলায়ন করব না। তোমরা আসন্ন মৃত্যু বা তদপেক্ষা গুরুতর লাঞ্ছনার আশঙ্কায় যাচ্ছ—তোমাদের কার্য নিন্দনীয় নয়। কিন্তু আমার সে কারণ নেই। তুমি যেদিন জয়ী হয়ে বালীকে পরাজিত ক'রে ফিরে আসবে, সেদিন আমি বিজয়মাল্য দিয়ে তোমাকে বরণ করব। তার পূর্বে আর আমাদের মিলনের সম্ভাবনা নেই। আরও দেখ, অপর কোন সজ্জন নারী কি পুত্রকন্যা নিয়ে গেলেন না, তোমার স-সঙ্গিনী যাওয়া শোভন হবে না।'

বলতে বলতেই দু' হাত দিয়ে প্রায়-অনড় সুগ্রীবকে বহির্গমন পথের দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, 'যাও যাও, আর নিমেষকাল সময়ও নষ্ট করো

না। নিজের কথা না ভাব, আমার কথা স্মরণ ক'রেও অন্ততঃ নিজেকে রক্ষা করো।'

এরপর আর বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ করলেন না সুগ্রীব।

এ নারীর আদেশ যত কঠোরই হোক—পালনে তাঁর সুখ।

॥ পাঁচ ॥

তার পর থেকেই—এই দীর্ঘকাল—বন্দিনী-দশা চলছে মনস্বিনী বহ্নিরূপিণী তারাদেবীর।

সাধারণ বন্দীদশার দুঃখও বোধ করি সহনীয়। এ যেন সুবর্ণ-শৃঙ্খলে বাঁধা তিনি। অনেকখানি স্বাধীনতা—কেউ তাতে কোন হস্তক্ষেপ করে না—কিন্তু সে-ই কি সমধিক দুঃখের কারণ নয়?

রূপবতী, বুদ্ধিমতী। রাজ্যশাসনের সমস্ত শক্তি তাঁতে বিদ্যমান। এর থেকে অধিকতর ব্যাপকতর কর্মক্ষেত্রও উপযুক্ত কর্ত্রীরূপে পরিচালনা করতে পারেন।

তাঁর পক্ষে পুরুষের উপেক্ষা বা ঔদাসীন্যই যে সর্বাপেক্ষা দুঃসহ।

অবমাননা—হ্যাঁ, তাঁর কাছে এটা অবমাননাই—দৈহিক লাঞ্ছনার অপেক্ষা অনেক বেশী অসহনীয়, অনেক বেশী যন্ত্রণাদায়ক।

যে মহাবলী পুরুষের তিনি প্রধানা সঙ্গিনী, সে ব্যক্তি কোনদিন তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত মাত্র করেন না। এই যে অনিন্দ্য রূপসজ্জা, যাকে বিধাতার সৃষ্টিকার্যের সংশোধন বলা চলে, যা ঈশ্বরদত্ত রূপকে কেবলমাত্র উজ্জ্বলতর নয়, প্রায় পরিবর্তিত ক'রে দেয়, শ্রেষ্ঠকেও শ্রেষ্ঠতর করে—সে সম্বন্ধে ঐ কামকীটটা সচেতন-মাত্র নয়। তারার অপেক্ষা রূপ বা রতিপাণ্ডিত্যে অনেক অপকৃষ্ট—শিক্ষাদীক্ষা-হীনা, যারা সুবিধা পেলেই, তাঁর আলিঙ্গনমুক্ত হওয়া মাত্র, ঐ গৃহদ্বারেই প্রহরারত তরুণ কিঙ্করদের আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়—তাদের নিয়েই দিনরাত কাটে বালীর, এমন কি

অপরূপা অতুলনীয়া রুমাতেও তাঁর অরুচি এসে গেছে। কাছে রাখেন এই মাত্র, দৈহিক সঙ্গ দেন কদাচিৎ।

ঋতুর পর ঋতুর আগমন ঘটে, তারা নবাগত ঋতুর উপযুক্ত প্রসাধনে সুসজ্জিতা হন। এমন কি কৃষ্ণপক্ষ শুক্লপক্ষ ভেদে প্রসাধনের যে পরিবর্তন আবশ্যক—সে সম্বন্ধেও তাঁর অভ্রান্ত ধারণা। কিন্তু কে তা দেখে মুগ্ধ হবে! অবশ্যই এ প্রাসাদে লালসাতুর রূপবান পুরুষের অভাব নেই, কিন্তু যা দেবভোগ্য বস্তু, রাজভোগ্য—তা পথের সারমেয়কে বিতরণ করা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। ধিক!

এইভাবেই চলছে অন্তহীন, উপায়ান্তরহীন প্রতীক্ষা।

সুগ্রীবের কোনদিন সাহস হবে কি বালীর সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করতে?

করলেই কি তিনি সক্ষম হবেন বিজয়ী হতে?

গোপনে চর বা দূত পাঠিয়ে কিছু বলিষ্ঠ তরুণ যোদ্ধা সংগ্রহ ক'রে সেই বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করলে হয়ত বালীকে পরাজিত করা যায়—কিন্তু সে বুদ্ধি বা উদ্যম সুগ্রীবের নেই, তা তারা বিলক্ষণ জানেন।

স্বভাব-অলস, কবি-প্রকৃতির মানুষ। তারা যে ওঁর প্রতি আকৃষ্ট, সে তো, পৌরুষের জন্য নয়—পুরুষ হিসাবে বালী অপেক্ষা যোগ্যতর আর কে আছে? চক্ষুষ্মান, শিল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, চারুকর্মের উপযুক্ত মর্যাদা দিতে সক্ষম—এমন মুগ্ধ ভক্ত হিসাবেই তিনি ওঁর প্রতি প্রসন্ন, করুণার্দ্র।

কাব্যের যেমন রসিক পাঠক না থাকলে কবির সৃষ্টি ব্যর্থ হয়, শিল্পকর্মেরও তেমনি, মুগ্ধ শুধু নয়, রসবেত্তা দর্শক ব্যতিরেকে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। রূপ বিধাতার সৃষ্টি, তিনিও অসামান্য শিল্পী সন্দেহ নেই—কিন্তু ত্রুটিহীন রূপসজ্জা যা সেই রূপকে শতগুণে লোভনীয়, আকর্ষক ক'রে তোলে—তা বোধ করি শ্রেষ্ঠতর শিল্পীর সৃষ্টিকর্ম। তার বোদ্ধা দর্শক না থাকলে সমস্তই তো নষ্ট।

অথচ তাই তো হচ্ছে। প্রতিদিনই তা এইভাবে বিনষ্ট, ব্যর্থ হয়ে চলেছে।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর।

এমনিই অতুলনীয় নিত্যনূতন সজ্জা—আবার সে সজ্জার ব্যর্থতায় এমনিই পাষাণ-কুট্টিমে অবলুণ্ঠিতা হয়ে হতাশায়, ক্ষোভে, রোষে এই ক্রন্দন।

অগ্রে পশ্চাতে উর্ধ্বে অধে—যতদূর দৃষ্টি এমন কি কল্পনা বা আশা পৌঁছয়—সীমাহীন অন্ধকার, অন্তহীন নৈরাশ্য।

কোথাও বিন্দুমাত্র আলোকরেখা চোখে পড়ে না।

আলোকের স্বপ্ন দেখারও কোন উপাদান নেই মনে বা মস্তিষ্কে।

উনি যে এমন ব্যাকুল হয়ে প্রাসাদের মুক্ত অলিন্দ থেকে ঋষ্যমূকের দিকে চেয়ে থাকেন প্রতিদিন—সে সম্বন্ধেও কি সুগ্রীব অবহিত?

মনে তো হয় না।

ঐ দূর থেকেও যদি সে চেয়ে দেখত একবার! পদ্মের মৃণাল-মধ্যস্থ শূন্যতা দিয়ে নিরীক্ষণ করলে বহুদূরের বস্তুও দৃষ্টিগোচর হয়। তাও যদি দেখত—ঐ ধরণের কোন অন্তঃসারশূন্য পুষ্পদণ্ডের মধ্য দিয়ে—হয়ত এ সজ্জার কিছুটা চোখে পড়ত। তাতে আশা না হোক লালসায় উজ্জীবিত হতে পারত লোকটা।

কিন্তু আজ সেই বর্ণহীন বৈচিত্র্যহীন হতাশার পুনরাবৃত্তি, শেষ অবধি অপরিমিত সুরাপানে অচেতন হওয়ার নিত্য একই প্রকারের ঘটনার মধ্যে অকস্মাৎই যেন ছেদ পড়ল একটা।

কোথাও কোন আশা নেই, তত্রাচ যেন কতকটা অভ্যাসবশতঃই মহাদেবী তাঁর গুপ্তচরী-নিয়োগ-প্রথা বজায় রেখেছিলেন। ওরা ঋষ্যমূক থেকেও প্রায়শ-সুগ্রীব ও তাঁর অনুচরদের স্বাস্থ্য এবং নৈষ্কর্মের সংবাদ সংগ্রহ ক'রে আনত।

সংগ্রহ করত কিন্তু অপ্রয়োজনবোধেই ইদানীং আর তা প্রত্যহ

ওঁকে নিবেদন করতে আসত না। কারণ প্রতিদিন একই অরুচিকর সংবাদ শুনতে শুনতে রুষ্ট হয়ে উঠতেন কর্ত্রী, প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ বা কণ্টকিত বেত্রদণ্ড তাড়নে তাদের ক্ষতবিক্ষত ক'রে দিতেন। সেই আশঙ্কাতেই আরও ওরা নিত্য দুঃসংবাদ শোনাতে সাহস করত না।

সন্ধ্যায় এসে গৃহদ্বারের বাহিরে অপেক্ষা করত, কিছুটা শান্ত ও প্রকৃতিস্থ হওয়ার—প্রতিদিনকার এই উন্মত্ত রোদন ও নিঃশব্দ বিলাপের সাক্ষী ওরা—এই আবেগ সংবরণ ও মদিরাপান আরম্ভের মধ্যেকার দণ্ড-দুই সময়ই কিছুটা সহজ হতেন, কোন কোন দিন এই সময়টায় উনি নিজেই ওদের আহ্বান করতেন, তখন সাহস সঞ্চয় ক'রে নিকটে যেত।

আজ তার অন্যথা ঘটল। প্রবল ব্যতিক্রম।

এর জন্য কোন প্রত্যাশা ছিল না। যেমন গতানুগতিক ভাবে জীবন কাটে, তেমনিই কাটবে, এই জানতেন।

কিন্তু সে ধারণাকে ছিন্ন ক'রে প্রধানা গুপ্তসংবাদবাহিকা নেত্রবতী যেন উত্তর-পূর্বাগত ঝটিকার মতো গৃহে প্রবেশ করল। বেশ কিছুটা আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গেই বিজয়িনীর মতো দৃপ্ত কণ্ঠস্বরে আহ্বান করল, 'মহাদেবী, আজ কিছু নূতন সংবাদ আছে!'

'নূতন সংবাদ!'

অশ্রুবিধৌত অক্ষিপ্রান্তের কজ্জলরেখা অঞ্চলপ্রান্ত দিয়ে ঘ'ষে মুছতে মুছতে—বিকৃত প্রসাধন অপেক্ষা তাঁর স্বভাববর্ণ ও আকৃতি অনেক ভাল, সে সম্বন্ধে তখনও সচেতনতার অভাব ছিল না—উঠে বসলেন।

'কী সংবাদ রে নেত্রবতী? মহামতি সুগ্রীব কি রণসজ্জার আয়োজন করছেন? তিনি কি শেষ অবধি তাঁর জড়তা ও আলস্য দূরীভূত করতে পারলেন?'

এবার যেন নেত্রবতীর বিজয়গর্বের ভাব কিছুটা মন্দীভূত হয়। কণ্ঠস্বর অত সহজে আর উচ্চ-গ্রামে ওঠে না। কিছুটা দ্বিধা সংশয়ের সঙ্গেই যেন বলে, 'রণসজ্জা করছেন—কিন্তু সে—'

বলতে বলতে থেমে যায়। সকণ্টক বেত্রদণ্ড বা কোন প্রস্তরখণ্ড হস্ত-প্রসারণের সীমায় আছে কিনা দেখে নেবার চেষ্টা করে।

'কিন্তু কি বল? থামলি কেন?' অধীর হয়ে ওঠেন তারা।

'রণসজ্জা কিষ্কিন্ধ্যা জয়ের জন্য নয় মহাদেবী, (মহাদেবী সম্বোধন তারাই অভ্যাস করিয়েছেন অনুচরী, সহচরী ও কিঙ্করীদের), এ রণসজ্জা আত্মরক্ষার জন্য। কোন সৈন্য সংগ্রহ বা অস্ত্র, কি যুদ্ধকালীন খাদ্য সঞ্চয়ের আয়োজন নেই। ওঁরাই কয়েকজন প্রস্তুত হচ্ছেন মাত্র, সর্জ্জবৃক্ষ ও বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড সংগ্রহ ক'রে।'

'তার অর্থ!' ওষ্ঠে অবজ্ঞার একটা প্রকট ভঙ্গী ক'রে বলেন তারা, 'কে আবার ওঁদের ঐ আশ্রয়টুকু নষ্ট করতে চাইছে? এমন বাতুল কে এল? না কি বালীই অপর কাউকে পাঠাবার সঙ্কল্প করেছেন?'

'না, না। সে সব কিছু নয়। যতদূর শুনে ও দেখে এলাম—দুটি মাত্র প্রাণী, সম্ভবতঃ উত্তর-দেশাগত দুটি আর্যসন্তান, যদিচ তাঁদের পরিধানে আমাদের মতোই বল্কল, মৃগচর্মের বর্ম—কিন্তু তাঁদের উজ্জ্বল বর্ণ, দীর্ঘ সুগঠিত দেহ, অপরূপ কান্তি এবং সঙ্গে খড়্গ ও ধনুর্বাণ দেখে মনে হচ্ছে, ওঁরা আর্যবংশোদ্ভব কোন রাজা বা রাজপুত্র হবেন।'

'দু'জন মাত্র! তার জন্য এঁদের রণসজ্জা! এঁরা শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন! হায় হায়! বুদ্ধিও বটে! ওঁরা এই ঐশ্বর্যশালিনা কিষ্কিন্ধ্যা পরিহার ক'রে নগণ্য ঋষ্যমূক আক্রমণ করবেন কেন? আর তাতে এত ভয়েরই বা কি আছে?'

তাচ্ছিল্য বিদ্রূপে তারাদেবীর কণ্ঠস্বর শাণিত হয়ে ওঠে।

বেত্রদণ্ডটা আপাততঃ পার্শ্বে নেই—লক্ষ্য ক'রে নেত্রবতী আশ্বস্ত হয়েছে। সে বলল, 'ওঁদের অভিপ্রায়টাই যে জানা যাচ্ছে না। তাইতেই তো এত আশঙ্কা এঁদের। অনিশ্চয়তাই যে নানা সংশয় ডেকে আনে। তদুপরি ওঁদের আকৃতি দেখেই মনে হয়, বীর্যবান শুধু নয়, ওঁরা যথেষ্ট রণদক্ষ। সঙ্গের অস্ত্রগুলি যেন সাক্ষাৎ কৃতান্ত-নির্মিত—যেমন মারাত্মক, তেমনি বহু ব্যবহৃত। দুটি তরুণেরই সুগৌর সুগঠিত সুন্দর

দক্ষিণ বাহু যেন অবিরাম ঘর্ষণজনিত কঠিন ব্রণাঙ্কিত। শুনেছি, ধনুর জ্যা রোপণে নিত্য অভ্যাস থাকলেই কোমল লোহিতাভ শুভ্র চর্ম এমন কুশ্রী ব্রণাঙ্কিত হয়। অর্থাৎ ওঁরা যে যোদ্ধা এবং বীর, তাতে সংশয় মাত্র নেই।'

কুটিল সন্দেহ, আশঙ্কা ও প্রবল কৌতূহল ; তার মধ্যেই তারাদেবী অভ্যস্ত কৌতুকের লোভ সংবরণ করতে পারেন না। চক্ষুর একপ্রকার বিশেষ ভঙ্গী ক'রে বলেন, 'তুই যে দেখছি মোহিত হয়ে গেছিস ওদের দেখে ?'

'তা হয়েছি মহাদেবী, অকপটেই স্বীকার করছি। ঐ রূপবান দুটি তরুণ যুবা যদি এক রাত্রের জন্যও ওদের সেবা করার অনুমতি দিত—আমাব জন্ম সার্থক মনে করতাম, পরক্ষণেই মৃত্যু ঘটলেও তাতে দুঃখ বোধ হ ত না!'

'এত সুন্দর! এত সুপুরুষ!' এবার তারা উঠে দাঁড়ান, গবাক্ষ দিয়ে ঋষ্যমূকের সানুদেশের দিকে তাকান, কিন্তু বনস্থলীর ছায়ান্ধকারে কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না।

'তা তাদের পরিচয় কিছু পেলি ? বলছিস বীর, বলছিস রাজপুত্র—তা দিগ্বিজয়ে এসেছেন মহাবীররা, সঙ্গে কোন সেনা নেই, যুদ্ধের আয়োজন নেই - এই বা কেমন কথা!'

তারপর কিছুকাল ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে নীরবে যেন কি ভেবে নিয়ে বলেন, 'কে জানে ওরা হয়ত উত্তরাখণ্ডের কোন রাজার প্রেরিত চর, এদেশের শক্তি সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করতে এসেছে। এদের প্রধান শক্তি কি, কোন্ কোন্ অস্ত্র ব্যবহার করে—কোন্ পথে কিভাবে আক্রমণ করলে, কাদের হস্তগত করলে সুবিধা হবে—এই সব তথ্য জানতে চায়। তা তাদের পরিচয় কিছু পেলি ?'

'না দেবী, সে ওঁরাও পান নি। মহাবীর হনুমান সে ভার নিয়েছেন। কিন্তু তিনিও আর দুই একদিন ওঁদের ভাবভঙ্গী দেখে তবে ওদের সম্মুখীন হবেন—এই তাঁর অভিপ্রায়। মহাবীর বলেন, বৃথা বা

অতিরিক্ত আত্মপ্রত্যয় পরিহার, সর্ববিধ সতর্কতা অবলম্বন এবং সবাগ্রে প্রতিপক্ষ সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য আহরণ, তাদের বুদ্ধি এবং মানসিক গতি লক্ষ্য করাই প্রকৃত রণকৌশল।'

'কিন্তু সে উনি যাই বলুন, উনি আবার বড় বেশী সাবধানী। তা আমি খবর পাবো কিভাবে?'

বেশ একটু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেন তারাদেবী।

নেত্রবতীর যেন সেই অনুপাতেই পুনশ্চ বিজয়িনীর ভাব প্রকাশ পায়।

'সে ব্যবস্থা আমি করেই এসেছি মহাদেবী। আপনার অপর গুপ্তচরী বিদিশাকে রেখে এসেছি। সে অল্পবয়স্কা বালিকা মাত্র, বৃক্ষারোহণে বিশেষ পটু। তার গতিবিধিও সরীসৃপের মতোই নিঃশব্দ। যে বৃক্ষ-তলে ঐ দুটি রাজপুত্র—রাজপুত্রই হবেন, আমার এ দৃঢ় বিশ্বাস—বিশ্রাম করছেন, ওঁদের অলক্ষ্যে তারই এক শাখায় আরোহণ ক'রে বসে আছে সে, ওঁদের কথোপকথন শুনছে।'

'কিন্তু সে ওদের ভাষা বুঝবে কি ক'রে?'

'তাতে কিছু অসুবিধা হবে না। আপনি বিস্মৃত হয়েছেন, বিদিশাকে একদা কিছু কিছু আর্যভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা আপনিই ক'রে দিয়েছিলেন, এই কার্যে প্রয়োজনে লাগতে পারে বলে। তা ব্যতীত, ওঁরা দুটি বনচারী নিষাদকে বিনয় বাক্যে বশ ক'রে তাদের নিকটে আনতে পেরেছেন, ওঁদেরও তো সংবাদ সংগ্রহ প্রয়োজন। তাদের সঙ্গে ওঁরা কতকটা আমাদের ভাষাতেই কথা বলছেন। মনে হয় ওঁরা দীর্ঘকাল এই পবিত্র দক্ষিণাবর্তে বাস করছেন। সব শব্দের নির্ভুল প্রয়োগ করতে না পারলেও বাক্যার্থ হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে ওঁদের ব্যবহৃত ভাষাই যথেষ্ট। আমি যতদূর জানি—মহাবীর হনুমানও ঐ নিষাদ দুটির জন্যই অপেক্ষা করছেন। ওরা কিছু দূরে এলেই তিনি ওদের ধরবেন।'

সংবাদ নিবেদন পর্ব সমাপ্ত ক'রে নেত্রবতী দ্রুত মহাদেবীর দৃষ্টির অন্তরালে গিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। তার ললাট, কপোল ও

পৃষ্ঠেব চর্ম অন্ধকার মতো অক্ষত রইল। এখন সে নিশ্চিন্ত হয়ে তাম্বুলের দ্বারা ক্লান্তি অপনোদন করতে পারে।

পরন্তু এ সংবাদে তারাদেবীর ললাটের মেঘ বরং অধিকতর ঘনীভূত হল।

ওঁর শান্তি ও স্বস্তি কিছুই রইল না।

কে এরা? কি জন্য এসেছে?

কি এদের অভিপ্রায়?

সত্যই কি সুগ্রীবকে আক্রমণ করবে নাকি?

তবে তাতে ওদের লাভই বা কি হবে? কী আছে সুগ্রীবের, বস্তুতঃ সে তো দীন ভিক্ষুকের জীবন যাপন করছে। এত নির্বোধ কি কেউ আছে, যে ওর ঐ গিরিচূড়ার সামান্য দুর্গ আর সামান্য কিছু জমির জন্য যুদ্ধ করবে?

আসলে ওদেব অভিসন্ধি, গূঢ অভিপ্রায়টাই যে জানা যাচ্ছে না।

ওদেব মনের গোপন গতিবিধির সঙ্কীর্ণ বক্র বর্ত্ম।

যদি আক্রমণই করে সত্যসত্যই? সে ক্ষেত্রে কি সুগ্রীব জয়ী হতে পারবেন?

সে সম্ভাবনা অল্প। অথবা আদৌ নেই।

ওরা যে শ্রেণীর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত—এইমাত্র যা শুনলেন—অবশ্য স্ত্রীলোক চরে বিশ্বাস নেই ঠিক, মহামালীকে পাঠালে সে মৃত্তিকাপটে অঙ্কিত করে আনতে পারত—তাতে বৃক্ষ ও প্রস্তর সম্বল ক'রে কতক্ষণই বা যুদ্ধ করবেন?

পলায়ন করারও সাহস নেই। কারণ বালীর হস্ত সুদূরপ্রসারী, ক্রোধও অনির্বাণ। সে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা ছাড়া গতি থাকবে না। বরণ বলাও অতিশয়োক্তি। অনন্যোপায় মৃত্যুকে মৃত্যুবরণ বলা চলে না। নিহত হওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না বলাই উচিত।

আর, তার পর?

এতদিন যে ক্ষীণতম আশা সম্বল করে তারাদেবী দিন যাপন করছিলেন, তাও সমূলে বিনষ্ট হবে।

অস্থিরভাবে ছাদ, অলিন্দ এবং গৃহ বার বার পদচারণা বা যাতায়াত করতে করতে যখন প্রায় ধৈর্যের শেষ সীমায় উপনীত হয়েছেন, তখন কিশোরী বিদিশার আগমনবার্তা পাওয়া গেল।

বিদিশা মহামাত্য নলের পৌত্রী। এখন অসহায় ও নিঃসম্বল হয়ে পড়ায় ওঁর সংবাদ-সংগ্রহের কার্য গ্রহণ করেছে। অতিশয় চতুর ও বুদ্ধিমতী এই বালিকাটির বোধ করি অসাধ্য কিছুই নেই। ওঁর যতগুলি গুপ্তচর, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে, তার মধ্যে এই মেয়েটিই যে সর্বগুণসম্পান্না, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

স্থিরবুদ্ধি, দূরদৃষ্টি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং বাক্‌সংযম—রাজনীতি সম্পর্কিত কার্যের পক্ষে যে চারটি মহৎ গুণ একান্ত আবশ্যক তার সবগুলিই এই কিশোরীটির—প্রায়-বালিকার— আছে।

তারাদেবী ওর শক্তি, সাহস এবং ঔৎসুক্য লক্ষ্য ক'রে সেই কারণেই বিস্তর অর্থব্যয় ও অনুসন্ধান ক'রে আর্যভাষাবিদ্ এক ব্যক্তিকে আনিয়েছেন পারিশ্রমিকের অঙ্গীকারে—নিজের সম্মুখে রেখে বিদিশাকে শিক্ষিত করার চেষ্টা করেছেন। নিজের সম্মুখে রাখার অর্থ, উনিও যাতে কিছুটা আয়ত্ত করতে পারেন এবং অপর কেউ ওঁর অজ্ঞাতে না করতে পারে।

শত্রুর বা প্রবল কোন দেশের ভাষা আয়ত্ত করা একটা প্রবল অস্ত্রসংগ্রহেরই তুল্য।

আর্যরা যেভাবে শনৈঃ দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তাতে ওদের সঙ্গে মিত্রতা তথা বশ্যতাস্বীকার অথবা সংঘর্ষ অনিবার্য।

সে উভয় অবস্থাতেই—ওদের ভাষা সম্বন্ধে অন্ততঃ প্রাথমিক জ্ঞান আছে এবং সেই সঙ্গে বুদ্ধিও রাখে—এমন গুপ্তচর অবশ্যই প্রয়োজন হবে। ওঁর পুরুষ গুপ্তচরের সংখ্যাই সমধিক, তবে তাদের সাধ্য সীমিত, সেই জন্যই কয়েকটি স্ত্রী-সংবাদ-সংগ্রাহিকাও নিয়োগ করতে হয়েছে। যারা

বাক্যের উপর বুদ্ধিকে স্থান দেয়, অর্থাৎ রসনার রশ্মি যাদের হস্তগত এবং বাহ্বাস্ফোট বা আত্মপ্রচারের স্বাভাবিক লোভ দমন করতে পারে, এমন দেখেই অবশ্য এই কয়টি নারী সংগ্রহ করেছেন তিনি।

দেখে, বাজিয়ে—অর্থাৎ পরীক্ষা ক'রে।

তাদের মধ্যে বিদিশাই শ্রেষ্ঠ।

পুরুষ ও স্ত্রী উভয় কর্মীর মধ্যেই।

বিদিশার বুদ্ধি-উজ্জ্বল দৃষ্টি ও মুখের লালিত্য দেখে চিরদিনই তারাদেবী প্রসন্ন হয়ে ওঠেন, আজও তার ব্যতিক্রম ঘটল না।

যেন মন্ত্রবলে ওঁর ললাটের নিবিড় ভ্রূকুটি এবং দৃষ্টির অন্তঃপ্রসারজনিত শূন্যতা অন্তর্হিত হ'ল। তিনি একবারে হাতে ধরে এনে নিজের আসনে নিজের পাশে বসালেন।

বিধাতা যদি দিন দেন, কুমার অঙ্গদ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হলে মহামতি নলের নিকট এই বালিকাটিকে উনি প্রার্থনা করবেন। রাজ্য কেন, এই বালিকাটি কালে সাম্রাজ্য শাসনের দক্ষতাও অর্জন করবে—এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত।

কিন্তু বিদিশা যে সংবাদ দিল, তাতে ওঁর মুখের প্রসন্নতা শারদ-শুভ্র মেঘের মতোই যেন দূর দিগন্তে বিলীন হ'ল।

চিন্তার পুঞ্জীভূত মেঘ এসে জমল মসৃণ ও কিছু পূর্বের উজ্জ্বল ললাটে। দুই ভ্রূকুটিবদ্ধ চক্ষুর দৃষ্টি আবারও যেন মনের কোন গভীরে এই সংবাদের পূর্ণ তাৎপর্য এবং তার মধ্য থেকে নিজের ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতির সূত্র খুঁজে বেড়াতে লাগল।

সংবাদের প্রথম অংশ উৎফুল্ল হবার মতোই, কিন্তু দ্বিতীয়াংশ নয়।

বিদিশা অবশ্য এনেছে প্রচুর সংবাদ। ওদের কথোপকথন থেকে এতগুলি তথ্য সংগ্রহ করা বিস্ময়কর তো বটেই, প্রায় অবিশ্বাস্য।

ঐ দুটি যুবা পুরুষের মধ্যে যেটি বয়োজ্যেষ্ঠ, তার নাম রাম বা রামচন্দ্র। কনিষ্ঠটি লক্ষ্মণ।

উত্তরাখণ্ডের কোথায় নাকি এক কোশল দেশ আছে, তার অধিপতি মহাবীর্যশালী দশরথের পুত্র এরা। আরও দুই পুত্র আছে তাঁর, তাঁরা দেশেই থাকেন। এঁদের সকলের জ্যেষ্ঠ হলেন রামচন্দ্র।

দশরথ বিগত হয়েছেন, কিন্তু রামচন্দ্র সিংহাসনে অধিরোহণ করতে পারেন নি। ওঁর এক বিমাতা যুদ্ধকালে আহত স্বামীকে যথেষ্ট সেবা ক'রে দুটি বরের প্রতিশ্রুতি লাভ করেন। সেই বর—রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা হচ্ছে সংবাদ পেয়ে—দাবী করেন, দশরথকে তাঁর প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দেন। সত্যবদ্ধ রাজার—ওঁরাও সুসভ্য অনার্য জাতিদের মতো সত্যপালনকে ধর্ম বলে মনে করেন—সে প্রতিশ্রুতি পালন ছাড়া পথ ছিল না।

তাঁর এক বরে সেই বিমাতার পুত্রকে সিংহাসন দিতে হয়েছে। অন্য বরে রামচন্দ্রকে বনবাসে আসতে হয়েছে। রামচন্দ্র নাকি মহাবীর এবং খুব জনপ্রিয়। তিনি নিকটে থাকলে প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে ওঁর ভ্রাতা ভরতকে অপসারিত ক'রে রামচন্দ্রকেই হয়ত বসিয়ে দেবে—সম্ভবতঃ এই আশঙ্কাতেই ওঁর বনবাসের ব্যবস্থা।

রামচন্দ্রের অবশ্যই তেমন কোন অভিপ্রায় ছিল না।

পিতার আদেশ পালন, পিতার অঙ্গীকারকে সত্য করা তাঁর কর্তব্য, তিনি সেইভাবেই কাজ করেছেন।

এমন কি, অসুস্থ মর্মাহত পিতার সুস্থ হওয়ার জন্যও অপেক্ষা করেন নি। তখনই, সেইদিনই তিনি চীর-বল্কল ধারণ ক'রে বনে চলে এসেছেন। মা অপেক্ষা করতে বলেছিলেন, কিন্তু তিনি জানতেন, যতক্ষণ প্রিয়পুত্র সম্মুখে থাকবে, দশরথ লজ্জায় ও অনুশোচনায় দগ্ধ হবেন।

তবে তিনি একা বনে আসতে পারেন নি। ওঁর তরুণী স্ত্রী ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা সঙ্গে এসেছেন—এক প্রকার ওঁর অনিচ্ছাতেই।

রামচন্দ্র নিজেদের রাজ্যসীমায় তো নয়ই, নিকটেও থাকেন নি।

গঙ্গা পার হয়ে ক্রমাগত দক্ষিণে এসে হিংস্র শ্বাপদ এবং তাদের

অপেক্ষাও হিংস্র—রাক্ষস পিশাচ প্রভৃতি বন্য-বর্বর-মনুষ্য-অধ্যুষিত দণ্ডক-অরণ্যে নিজের বাসস্থান স্থির ক'রে নেন।

ক্রমে সে অরণ্যের প্রান্তসীমায় পঞ্চবটী নামে এক রমণীয়, নদী-পর্বত-ফলবান-বৃক্ষশোভিত অরণ্য নিজের বাসস্থান হিসাবে নির্বাচিত করেন এবং দীর্ঘকাল সেখানেই অবস্থান করেন।

সুখেই ছিলেন। পঞ্চবটী হিংস্র জন্তু ও হিংস্র মানব অধ্যুষিত হ'লেও অতি মনোরম ও নয়নানন্দদায়ক স্থান। সীতাদেবী ও রামচন্দ্র উভয়েরই খুব প্রীতিপ্রদ বোধ হয়েছিল। মনে হয়েছিল এর কাছে রাজ্যসুখও তুচ্ছ।

লক্ষ্মণ সর্বগুণোপেত একটি স্থান মনোনীত ক'রে সুন্দর এক কুটির নির্মাণ করেছিলেন। অদূরেই একটি রমণীয় সরোবর, সেখানে বালার্ক-বর্ণ রক্তোৎপল প্রস্ফুটিত। কিছু দূরে পুণ্যস্রোতা গোদাবরী নদী, একেবারে অগম্যও নয়। তার তীরে তীরে কুসুমিত বৃক্ষশ্রেণী, জলে হংস, সারস, চক্রবাক। নদীর ওপারে সু-উচ্চ পর্বতশৃঙ্গ সেখানে ময়ূররা অবাধে নিঃশঙ্কচিত্তে পুচ্ছ বিস্তার ক'রে নৃত্য করছে।

বন্য জন্তুদের আশঙ্কাতেই লক্ষ্মণ দৃঢ়ভিত্তিক, স্তম্ভশোভিত, সুরম্য এক পর্ণশালা প্রস্তুত করেছিলেন। প্রধানতঃ মৃত্তিকা নির্মিত হ'লেও সুপক্ক সুবৃহৎ বংশে তাকে ঘাতসহ করা হয়েছিল। তদুপরি শমীপত্র, কুশ ও কাশের আচ্ছাদন। কোমল শুষ্কপত্র ও মৃগচর্মের শয্যা, ভক্ষ্য হিসাবে ফলমূল ও কোমল মাংসের প্রাচুর্য। এর থেকে অধিক কি সুখে রাজারা কাল কাটান!

বনবাসের নির্ধারিত কাল শেষ হয়েও এসেছে, এমন সময়ে এক অঘটন ঘটল।

কিছুদিন পূর্বে ওঁদের অনুপস্থিতিতে এক রাক্ষস এসে রামের স্ত্রী সীতাদেবীকে হরণ করে নিয়ে গেছে। এ পর্যন্ত তাঁকে উদ্ধার করা যায় নি।

তাতেই রাম শোকাকুল হয়ে সীতার অন্বেষণে দেশে দেশে ঘুরছেন।

কে নাকি এক রাক্ষসই ওঁদের উপদেশ দিয়েছে এ দেশে আসতে।

কিষ্কিন্ধ্যার অধিপতি সুগ্রীব অতি সজ্জন ব্যক্তি। তাঁর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করলে তিনি চারিদিকে সংবাদ-সংগ্রাহক চর প্রেরণ ক'রে কোন্ রাক্ষস হরণ করেছে, কোথায় রেখেছে—সীতা জীবিতা কি মৃতা—সব সংবাদ এনে দেবেন।

প্রয়োজনমতো, যদি যুদ্ধ করতে হয়—বাহিনী নির্মাণেও সহায়তা করবেন। একক কোন দেশ বা রাজ্য আক্রমণ করা যায় না—তা আক্রমণকারী যত বীরই হোন।

দীর্ঘ কাহিনী বিবৃত ক'রে বিদিশা বোধ করি নিরতিশয় ক্লান্ত হয়েই নীরব হ'ল।

কিন্তু তারাদেবী তাকে বিশ্রামের এমন কি নিঃশ্বাস গ্রহণেরও অবসর দিলেন না, তাঁর কৌতূহল আশা-আকাঙ্ক্ষা আর ধৈর্য মানছে না। তিনি ব্যগ্র হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তার পর? তা এদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে?'

পরক্ষণেই হতাশা মিশ্রিত ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'আর যোগাযোগ হয়েই বা লাভ কি? বোঝা গেল, যে সংবাদ দিয়েছে, কিষ্কিন্ধ্যার অধিপতি সুগ্রীব, সে তার পরের ঘটনা অবগত নয়। সুগ্রীব নিজেই তো প্রায় এক বর্গ ক্রোশ স্থানের মধ্যে বন্দী। তিনি কি সাহায্য করবেন!'

বিদিশা একটু ক্লান্ত হাসির সঙ্গে বলে, 'না, মহাদেবী। সংবাদের এখানেই সমাপ্তি ঘটে নি। নিতান্ত শক্তির অভাবেই একটু নীরব হয়েছিলাম।'

'বল, বল। থামিস নি।' তারা ওর দুটো হাত চেপে ধরেন।

বিদিশা ধীরে ধীরে বলে, 'আমাদের জীবনে এক মহাবিপদ আসতে পারে এদের দ্বারা। মহা সর্বনাশ আসন্ন। সম্ভবতঃ নেত্রবতী আপনাকে জানিয়েছেন যে, বনমধ্যে দুটি নিষাদকে দেখে তাদের আহ্বান ক'রে নিকটে বসিয়ে এ দেশের সংবাদ ও তথ্যাদি সংগ্রহ করছেন ঐ দুই ভ্রাতা। বস্তুতঃ তাদের সঙ্গে কথোপকথন প্রসঙ্গেই আমার পক্ষে ওঁদের পরিচয় ও এখানে আগমনের হেতু জানা সম্ভব হয়েছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাতে কি হয়েছে? নিষাদরা কী এমন শত্রুতা করতে পারে?'

সংশয়ে, আশঙ্কায় অস্থির হয়ে ওঠেন তারাদেবী।

'পারে বই কি। একই তথ্য নানা ভাবে পরিবেশন করা যায় না কি? ঐ নিষাদ দুটি ওঁদের বক্তব্য ও উদ্দেশ্য শুনে বলেছে যে, মহামনা সুগ্রীব তো এক প্রকার ওঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হাতে বন্দী। এই ঋষ্যমূক পর্বত ত্যাগ ক'রে কোথাও যাওয়ার উপায় নেই তাঁর। সুগ্রীবের সঙ্গে অনুচর ও সেবক হিসাবেও অল্পসংখ্যক লোক আছে। দুর্দশাগ্রস্ত, বিপন্ন, নির্বাসিত সুগ্রীবের কাছে কেউ আসেও না। তাঁর চর নিয়োগেরও কোন সাধ্য নেই। যে কয়জন সাথী ওঁর সঙ্গে আছে, তারাও বালীর ক্রোধাগ্নির ভয়ে এই পর্বতসীমার বাইরে যেতে সাহস করে না। সুতরাং পরাজিত হতশ্রী বিপন্ন ব্যক্তির সঙ্গে মিত্রতা ক'রে কোন মঙ্গল নেই। তার থেকে ওঁদের কর্তব্য, বালীর সঙ্গেই সখ্য স্থাপন করা। ওঁরা যদি বালীর প্রিয়-কার্যসাধন হিসাবে সুগ্রীবকে বন্দী ক'রে বালীর হস্তে প্রদান করেন, তবে বালী অবশ্যই প্রত্যুপকার হিসাবে ওঁদের সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন। বালী মহাশক্তিশালী, বিশ্বত্রাস বললেও অল্প বলা হয়। তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তিও যথেষ্ট। তিনি সহায় হলে ওঁদের আর কোন অসুবিধাই থাকবে না।'

'তার পর? ওঁরা কি বললেন?'

তারা এতক্ষণ প্রায় রুদ্ধশ্বাসে বিদিশার সংগৃহীত সাংঘাতিক সংবাদ শুনছিলেন।

পাংশু, বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল তাঁর মুখ। ললাটে চারুকবরীর প্রান্তে অসংখ্য স্বেদবিন্দু ফুটে উঠেছে এই অল্পকালের মধ্যেই। কথা বলার সময়ও স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর প্রকাশ পেল না—মনে হ'ল প্রায়-বদ্ধ দন্তপংক্তির মধ্য থেকে ক্রুদ্ধ সর্পীর মতো চাপা গর্জন উঠল একটা।

তারার উগ্র মূর্তি দেখে ও এই সর্পীবৎ কণ্ঠস্বরে বিদিশা যেন ভয় পেয়েই গেল, ধীরে ধীরে বলল, 'ওঁরা তখনই কিছু বলেন নি। নিজেদের

মধ্যে নিম্নকণ্ঠে কি আলোচনা করছিলেন। সে এতই নিম্নকণ্ঠ যে, অত উচ্চশাখা থেকে তা শ্রবণ সম্ভব নয়। আর, আপনি এই সংবাদের জন্য অধীর হয়ে থাকবেন, তা জানি বলেই দ্রুতবেগে এখানে চলে এসেছি। মুহূর্তকালও কোথাও বিশ্রাম করি নি।'

তারপর বোধ করি একটু নিশ্বাস নিয়ে এবং সেই সঙ্গে ঈষৎ সাহস সঞ্চয় ক'রেও, অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তারার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আর, ভাবলাম, এ ক্ষেত্রে যদি আপনার কিছু করণীয় থাকে. এই সর্বনাশ রোধ করার কোন প্রবল প্রয়াস, সে জন্যও অবিলম্বে আপনাকে এ সংবাদ শোনানো প্রয়োজন। কারণ এসব সময়ে কালক্ষেপ করার অর্থই সর্বনাশের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া। তাই না? ওঁরা মনস্থির ক'রে কোন অকর্ম করে বসলে তা সংশোধনের তো আর কোন উপায় থাকবে না।'

তারা এই আসন্ন বিপদের কথা বিস্মৃত হয়ে কিছুক্ষণ নির্বাক বিস্ময়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন।

বিদিশা কি সত্যই বালিকা?

মধ্যে মধ্যে, বিশেষ ক'রে এইসব সময়ে কেমন যেন বিভ্রান্তি জাগে ওঁর মনে।

এই বয়সে এত গভীর বুদ্ধি, দূরপ্রসারী দৃষ্টি এবং কার্যের গুরুত্ব বিচার ক'রে কর্তব্য নির্ধারণ করা, আর কারো দেখেন নি। কারো এমন কার্যের অগ্রাধিকার সম্বন্ধে জ্ঞান আছে বলে শোনেনও নি।

মনে হয় বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী বুঝি বালিকার বেশ ধরে ওঁকে রক্ষা করতে এসেছেন।

কিন্তু এসব চিন্তার এখন সময় নেই।

আদৌ কোন সময় নেই। যা করতে হবে, এখনই, এই মুহূর্তে।

কি করতে হবে, তাও ভেবে নিয়েছেন। সংবাদটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই, চিন্তার যন্ত্রটা কার্য আরম্ভ ক'রে দিয়েছিল এবং একটা সঙ্কল্পে পৌঁছতেও বিলম্ব ঘটে নি।

তারাদেবী নিজের কণ্ঠ থেকে শ্বেতরক্ত-মিশ্রিত প্রবালের কণ্ঠহার খুলে বিদিশার কণ্ঠে পরিয়ে দিয়ে বলেন, 'এটা তোর সামান্য পুরস্কার। যদি দিন আসে, রত্নহার পরিয়ে দেব তোর গলায়। কিন্তু সে কথা এখন নয়। তুই খুবই ক্লান্ত বুঝতে পারছি—খুবই ক্লান্ত—সে তোর ঘর্মাক্ত কলেবর আর চক্ষুর অপরিসীম শ্রান্ত দৃষ্টি দেখেই বুঝছি। তবু তোকে বিশ্রামের অবসর দিতে পারব না বিদিশা। আমি, তুমি, তোমার বংশের অপরাপর সকলেই এক মহা সর্বনাশের সম্মুখীন হয়েছি। এ বিপদ যেমন অকস্মাৎ এসেছে, তেমনিই ত্বরিতগতিতে—বিন্দুমাত্র কালহরণ না ক'রে সর্বপ্রযত্নে তার সম্মুখীন হতে হবে। সময় আর আদৌ নেই।'

বিহ্বল বিদিশা বলে, 'কিন্তু আপনার কি আদেশ, তাই তো এখনও জানলাম না।'

'আদেশ নয় বিদিশা। তোমার যা কার্য, তা তুমি সুন্দরভাবেই শেষ করেছ। এবার যা করার আমাদেরই করতে হবে। তুমি শুধু আমার সঙ্গে যাবে।'

'যেতে হবে? আপনার সঙ্গে? কিন্তু আপনি এখন কোথায় যাবেন?'

'ঐ যেখানে সেই তুটি রাজকুমার অবস্থান করছেন দেখে এসেছ, যে বৃক্ষতলে বসে নির্বোধ নিষাদগুলোর সঙ্গে আলোচনা করছিলেন ওঁরা—হয়ত এতক্ষণে সে আলোচনা শেষ হয়ে গেছে—সেইখানে যাব। ওঁদের সঙ্গেই দেখা করব। আমি একাই যেতে পারতাম, তোকে কষ্ট দিতাম না; এখনই এতটা তুর্গম দীর্ঘ পথ ছুটে এলি—কিন্তু আমি তো সে স্থান জানি না। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। অন্ধকার রাত্রি, আমি কোথায় তাদের অন্বেষণ করব? হয়ত সারা রাত্রিই ঘুরে বেড়াতে হবে। ততক্ষণে অনিষ্ট যা হবার হয়ে যাবে। তুই একটু কষ্ট ক'রে চল মা।'

'না না। আমার কষ্টের প্রশ্নই ওঠে না।' বিদিশা ব্যস্ত হয়ে ওঠে, 'আমি এখনও সে পথ তিন-চার বার যাতায়াত করতে পারব।

কিন্তু দেবী, আপনার যে বড় কষ্ট হবে। অন্ধকারে বন্য পার্বত্য পথ অতিক্রম—সে তো আদৌ কোন পথই নয়—রাজধানীর সীমা যেখানে শেষ, সেখান থেকেই গভীর অরণ্য আরম্ভ। শিলাকীর্ণ, কণ্টক-গুল্মে পূর্ণ, সরীসৃপ শ্বাপদের রাজ্য সে। আপনি কেমন ক'রে যাবেন? প্রদীপ জ্বেলেও যাওয়া যাবে না, প্রথমতঃ বাতাসে প্রদীপ থাকবে না। দ্বিতীয়তঃ এই গাঢ় অন্ধকারে প্রদীপের আলো বহুদূর থেকে দেখা যায়। কার চোখে পড়বে, সে যদি আলোক অনুসরণ ক'রে এসে অন্তরাল থেকে দেখে, এ সংবাদ প্রাসাদে প্রচার করে? প্রত্যূষকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাবে না? ক্ষতি কি?'

উৎসুক মুখে ওঁর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে বিদিশা।

'যদি ওরা ইতিমধ্যেই মনস্থির ক'রে থাকে? যদি রাত্রেই এসে এখানে উপস্থিত হয়? অথবা ঊষার আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে? ওরা যেমন কাতর আর অস্থির তুই বলছিস, সামান্যমাত্র কালক্ষেপও ওদের কাছে অসহ্য বোধ হতে পারে। না বিদিশা, আমার মন বলছে আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা করা ঠিক নয়। তুই একটু সঙ্গে চল শুধু, আর কোন দায়িত্ব নেই তোর। নয় তো নেত্রবতীকে ডাকতে হয়। তবে তাকে আমি নিতে চাই না, তার ওপর ঠিক কতটা আস্থা স্থাপন করা যায়—তার এখনও কোন পরীক্ষা হয় নি। এ বিপদে হিসাবের সামান্যতম প্রমাদও অধিকতর সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে।'

'না, না। আমিই যাবো। আপনি যদি যেতে পারেন—আমার কোন কষ্ট হবে না। আপনি প্রস্তুত হোন।'

'প্রস্তুত! এখনই এই অবস্থায় যাবো। দাসীর একটা বহির্চ্ছদ রাখাই আছে, আচ্ছাদনী—সেইটেতেই আত্মগোপন ক'রে বেরিয়ে যাবো দুর্গ থেকে।'

॥ ছয় ॥

আরও একটি ব্যক্তি তারাদেবীর পূর্বেই রামচন্দ্রের অরণ্য-আবাসের নিকটে পৌঁছে গিয়েছিলেন।

তিনি মহাবীর হনুমান।

সুগ্রীবের সর্বাপেক্ষা কর্মঠ, বুদ্ধিমান ও বিশ্বস্ত সেবক।

সুগ্রীবের সঙ্গে যাঁরা এই ঋষ্যমূকে এসেছেন—তাঁদের সকলেই বুদ্ধিমান, বলবীর্যেও তাঁরা ন্যূন নন—কিন্তু তাঁদের মধ্যেও হনুমান বিশেষ একজন. তিনিই শ্রেষ্ঠ।

সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান, সর্বাপেক্ষা বলশালী।

মনে হয় একটা পর্বত-শৃঙ্গ বহন করাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব হবে না—তেমন প্রয়োজন হলে। বস্তুত তাঁর অপেক্ষা অধিক দৈহিক শক্তি বালী ব্যতীত এ রাজ্যে কারও ছিল না। সেই জন্যই তাঁর অপর নাম মহাবীর।

এবং—তিনি বুদ্ধিমানই শুধু নন, রাজনীতিতে সুপণ্ডিত, কলাকৌশলে, দক্ষ। এই আরণ্যরাজ্যে বাস ক'রে যতটা জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব তা তিনি করেছেন।

সবচেয়ে যা তাঁর প্রশংসার্হ, তা হ'ল তাঁর অসামান্য প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব।

আরও একটি ক্ষেত্রে তিনি একক—এ পর্যন্ত তাঁকে কেউ রমণীলোলুপ হ'তে দেখে নি।

এ হেন হনুমানই সংবাদ-সংগ্রহের ভার নিয়েছেন এই দুটি তরুণ যুবাপুরুষ সম্বন্ধে। সেই সঙ্গে যদি অবস্থা অনুকূল হয়, এঁদের অভিপ্রায় ও মনের গতি বুঝে—সখ্যস্থাপনও।

সেজন্য কিছু ছদ্মবেশও ধারণ করেছেন উনি। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে এসেছেন। বাহুমূলে বদ্ধ একটি গ্রন্থোপম বস্তুও বস্ত্রাবৃত ক'রে আনতে ভুল হয় নি।

আয়োজন সবই প্রস্তুত। সাহসেরও অভাব নেই—তথাপি হনুমান তখনই ওঁদের সম্মুখে আসতে ইতস্ততঃ করছেন।

বড় বেশী শাণিত ও সাংঘাতিক অস্ত্র ওঁদের সঙ্গে। দৃষ্টি ক্রুদ্ধ, উদ্বিগ্ন—যেন সঙ্কল্পে দৃঢ় হওয়ারই পথ অন্বেষণ করছেন।

কি করতে এসেছেন ওঁরা, সে সংবাদ জেনেছেন।

ছুটি নিষাদ ওঁদের সঙ্গে অনেকক্ষণ বসে কি সব আলোচনা করছে, তা উনি দূর থেকেই লক্ষ্য করেছেন।

কী আলোচনা সেটা জেনেছেন—তারা যখন বনপথে নিজেদের আবাসের দিকে যাচ্ছিল তখন।

কিছুদূর যাবার পরই—ঐ ছুটি আর্যদেশাগত তরুণের দৃষ্টি ও শ্রুতিসীমার বাহিরে যাওয়া মাত্র—ছুটি বিরাট পরুষ ও বলিষ্ঠ হস্ত ছুজনের গলদেশে দিয়ে ছু'জনকেই শূন্যে তুলে আছাড় দিয়েছেন।

তারপর ঐ ভয়ঙ্কর ব্যক্তির কাছে কোন কথা গোপন করবে—সে ছুঃসাহস সামান্য পশুচর্ম-ব্যবসায়ীর থাকা সম্ভব নয়।

আর প্রয়োজনই বা কি ?

ওরা তো কোন গোপনতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসে নি।

সবই বলেছে ওরা। সব কথা, ওরা কি পরামর্শ দিয়েছে তাও।

ফলে হনুমানের ছুশ্চিন্তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। সতর্কতার প্রয়োজনও বুঝেছেন।

ওঁরা কি স্থির করেছেন—সেটার একটু আভাস পেলেও অগ্রসর হতে পারেন। নতুবা, সুগ্রীব-বধেই ওঁরা যদি স্থিরনিশ্চয় হয়ে থাকেন, তার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ওঁকে বধ করাও আশ্চর্য না।

সেই আভাসটা কিভাবে পাবেন, তাও বুঝতে পারছেন না।

জ্যেষ্ঠটি বসে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছেন আর অর্ধস্ফুট স্বরে কী সব বলছেন। কনিষ্ঠও তার উত্তর দিচ্ছেন—তবে সর্বক্ষেত্রে নয়। হয়ত জ্যেষ্ঠ যা বলছেন তা প্রশ্ন নয়, স্বগতোক্তি।

আরও কিছুক্ষণ দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা ক'রে নিয়ে ওঁদের দিকে অগ্রসর হতে যাবেন, সহসা মহাবীরের সদাসতর্ক কর্ণে দূরাগত মৃদু পদশব্দ শোনা গেল।

খুবই দূরাগত, খুবই মৃদু। শব্দ না করারই চেষ্টা করছে কেউ প্রাণপণে, কিন্তু শুষ্ক পত্রপল্লব আর উপলখণ্ডের উপর পদক্ষেপ—সহস্র সতর্কতাতেও একেবারে শব্দ রোধ করা যাবে না।

এবং সে সামান্য শব্দ এ দের কর্ণে না পৌঁছলেও মহাবীরের কর্ণে প্রবেশ করবে।

এইজন্যই তিনি বিখ্যাত। জনশ্রুতি—তিনি যোজন-দূরের পদশব্দও শুনতে পান এবং সে শব্দ মানুষ কি পশুর, শ্বাপদ সরীসৃপ, কার পদক্ষেপের শব্দ, কোন্ দিক থেকে কোন্ দিকে যাচ্ছে বলে দিতে পাবেন।

আজও শব্দ পাবার সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক এবং উৎকর্ণ হলেন। স্থির হয়ে যেন নিশীথ অন্ধকারের দিকে কান পেতে রইলেন।

না, পশু নয়। যে আসছে সে মানুষই।

আর—সেও নয়, যারা। দুটি প্রাণী আসছে।

একজন অল্পবয়স্ক, অপরজন কিছু বড় তার চেয়ে। একজনের পদশব্দ অতি লঘু আর একজনের দেহ কিছু ভারী, অর্থাৎ বয়স বেশী।

এখানে মানুষ!

এত রাত্রে, এই গহন অরণ্যে?

কে আসছে? কী উদ্দেশ্যে?

মহাবীর হনুমান তাঁর হস্তের যষ্টি, যেটাকে বৃদ্ধ ভিক্ষাজীবীর পথ-চলার অবলম্বন হিসাবে ধরে ছিলেন, সেটাকেই বজ্রমুষ্টিতে উদ্যত ক'রে রাখলেন। প্রয়োজনের সময় তিলার্ধ না বিলম্ব ঘটে।

যারা আসছে, তাদের গতি খুবই দ্রুত, তাতে সন্দেহ নেই।

যদি এমন হয় যে, এই দুই যুবাকে কেউ আক্রমণ করতেই আসছে, অতর্কিতে, তাহলে অন্ততঃ ওদের প্রস্তুত হবার সময় দিতে তো পারবেনই। আর, যদি এদেশীয় কেউ হয়, তাহলে, একমাত্র বালী ছাড়া, তাঁর এই যষ্টি এবং দুটি হাতই যথেষ্ট।

একবার এমনও মনে হ'ল, বালীই আসছেন না তো? অকস্মাৎ এসে

পড়ে এঁদের স্বদলে আনতে, এঁদের সঙ্গে সন্ধি ক'রে সুগ্রীবকে বন্দী বা নিহত করতে ?

আবার তার পরই তার অসম্ভাব্যতা নিজের মনেই বুঝলেন।

ঐ নিষাদ দুটি এখনও বেশীদূর যায় নি। বিশেষ এই রাত্রে দুর্গের মধ্যে গিয়ে বালীকে সংবাদ দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, বালীরও এখন সে সংবাদ শোনার মতো অবস্থা নয়।

তবে এ সব চিন্তাই চোখের নিমেষে মনে খেলে গেল মহাবীরের। আর বেশী অবসরও ছিল না। কারণ, গোপনচারীরা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওঁর এবং ঐ দুটি যুবা পুরুষেরও দৃষ্টিসীমার মধ্যে এসে গেল।

কিন্তু, যারা এল —আর যত কথা বা যাদের কথাই কল্পনা করুন না কেন—তাদের কথা তাঁর মনের সুদূর দিগন্তেও দেখা দেয় নি।

দুটি স্ত্রীলোক।

কোশল রাজকুমারদের সম্মুখে যে অগ্নি প্রজ্বলিত ছিল, তাতে অন্যমনস্ক গভীর দুশ্চিন্তারত কুমাররা এ পর্যন্ত কোন নূতন কাষ্ঠ নিক্ষেপ করেন নি। ফলে, তার দীপ্তি অতিশয় স্তিমিত হয়ে এসেছে—তাতে দুটি স্ত্রীলোক দেখা গেলেও মুখ ভাল ক'রে দেখা বা চেনা গেল না।

একেবারে ওঁদের সম্মুখে এসে দাঁড়াতেও না।

কারণ যেটিকে বয়োজ্যেষ্ঠা বলে মনে হ'ল সে অবগুণ্ঠনবতী, কনিষ্ঠাটি—আকৃতি দেখে মনে হয় বালিকাই—সে ওর পিছনে, ছায়ান্ধকারে।

তবে বেশীক্ষণ সংশয়ে থাকতে হ'ল না।

বিস্ময়, অপরিমাণ বিস্ময় এসে এবার সংশয়ের স্থান অধিকার করল।

রমণীটি সামান্যা দাসীর বহির্চ্ছদ মোচন করা মাত্র মহাবীর যেন একটা সজোর দৈহিক আঘাতে দুই পা পিছিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণের জন্য মনে হ'ল, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল তাঁর।

এঁরা সকলেই নিজেদের বিস্ময়ে অভিভূত ছিলেন বলে সে বিলম্বিত প্রশ্বাসের শব্দ কেউ পেল না।

তারাদেবী !

বালীর প্রধানা সঙ্গিনী, কিষ্কিন্ধ্যার কর্ত্রী !

এত রাত্রে ? এই ভাবে ! একা ! সামান্যা দাসীর উত্তরীয়ে মুখ আবৃত ক'রে !

হ্যাঁ। একাই বলতে হবে। সঙ্গের বালিকাটিকে আর চিনতে অসুবিধা হয় নি মহাবীরের -- নলের পৌত্রী, বিদিশা।

ও তো বালিকা মাত্র। ওর ভরসায় বন্যপথে আসাও যা, একা আসাও তাই।

বিদিশার কথাটা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই—কেন ওকে সঙ্গে এনেছেন তারা—তার কারণটা নির্ণয়েও বিলম্ব হ'ল না।

বিদিশা নিশ্চয় ওঁর গুপ্তচরের বৃত্তি গ্রহণ করেছে।

বিদিশাই এঁদের বার্তা নিয়ে পৌঁছেছে মহাদেবী তারার কাছে সেইজন্যই পথপ্রদর্শিকা রূপেও তাকেই সঙ্গে আনতে হয়েছে।

কিন্তু তারার উদ্দেশ্য কী ?

উনি কি বালীর সঙ্গে সখ্য স্থাপনের অনুরোধ নিয়ে এসেছেন ?

তবে, তাই বা কেমন ক'রে হবে ?

মহাবীর আপনমনেই মাথা নাড়েন। যতদূর উনি অবগত আছেন—তারাদেবী সুগ্রীবেরই কল্যাণপ্রার্থিনী।

তা হলে ?

অবশ্য এসব চিন্তা দুই-চার লহমার বেশী সময় নেয় নি মহাবীরের মনে খেলে যেতে—আর সেই অত্যল্পকালের মধ্যেই উত্তরও পেয়ে গেলেন।

কোশল রাজকুমাররা সেই সময়টায় সত্যই ইতিকর্তব্য নির্ধারণে নিবিষ্ট ছিলেন। বোধ হয় নিমজ্জিত ছিলেন বলাই উচিত।

কবন্ধ নামে মাংসপিণ্ডাকার একটা রাক্ষস মৃত্যুর পূর্বে ওঁদের সুগ্রীবের কথাই বলে গেছে, তাঁরই শরণ নিতে বলেছে। সুগ্রীব ধার্মিক, ভদ্র। সে

ওঁর দুঃখও বুঝবে। অথচ এখানে এসে যা শুনছেন, সুগ্রীবকে দিয়ে কতটুকু উপকার ওঁদের হবে? তাঁর কতটুকু সাধ্য? তিনি নিজেই তো বন্দী। রাজক্ষমতা যার হাতে আছে, সে-ই পারে ওঁদের অভীষ্ট সাধন করতে।

এই দুর্ভাবনায় মগ্ন ছিলেন বলেই এ পদশব্দ একেবারে নিকটে আসার পূর্বে পান নি।

সে শব্দ কানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই দুটি মূর্তিও দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

আর পলকপাত মাত্রেই দু'জনে উন্মুক্ত খড়্গহস্তে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

রাক্ষস পিশাচ বা এই শ্রেণীর নর-বিদ্বেষী কোন ব্যক্তি—ভাবাই স্বাভাবিক।

তবে, যাঁরা এসেছেন তাঁরাও—ওঁদের অনুমান বা আশঙ্কা কোন পথে যাবে তা জানতেন, পূর্বেই সে কথা চিন্তা করেছেন।

তাই সম্মুখবর্তিনীটি প্রায় নিমেষের মধ্যেই অবগুণ্ঠন মোচন ক'রে দুই হাত জোড় ক'রে আর্যদের মতোই নমস্কারের ভঙ্গী করলেন।

নারী! এবং সুচারুসজ্জিতা সভ্য নারী।

উদ্যত-খড়্গ দুজনের হস্তই অবনমিত হ'ল।

লক্ষ্মণ রামকে পুরোবর্তী রেখে নিজে পিছিয়ে এসে নির্বাপিতপ্রায় অগ্নিতে কিছু কাষ্ঠ ও শুষ্ক পত্রপল্লবাদি নিক্ষেপ করলেন।

প্রায় তৎক্ষণাৎ অগ্নি দ্বিগুণ তেজে বর্ধিত হ'ল। শুষ্ক পত্রের জন্য সে অগ্নি শিখাকারে উত্থিত হয়ে বেশ কিছু আলোকও বিকীরণ করল চতুর্দিকে।

সে আলোকে, রামচন্দ্রের এতক্ষণের অন্ধকারে অভ্যস্ত চক্ষু, এঁদের ভাল ক'রেই দেখল।

দেখলেন, এই নিশীথচারিণী অনার্যদুহিতা হলেও পরম রূপবতী এবং নিঃসংশয়ে সম্ভ্রান্তবংশীয়া।

তিনিও ঈষৎ আনত হয়ে প্রতি-নমস্কার জানিয়ে বললেন, 'মনস্বিনী, আপনি কে জানি না। কী উদ্দেশ্যে এসেছেন তাও বুঝতে পারছি না।

যদি কোন কারণে বিপন্ন হয়ে থাকেন তো বলুন, আপনাকে কি ভাবে সাহায্য করতে পারি ? আমি কোশল-নৃপতি বিশ্বত্রাস দশরথের পুত্র রাম, ইনি আমার অনুজ লক্ষ্মণ। আমাদের হস্তে অস্ত্র এবং দেহে একবিন্দু রক্ত বহমান থাকতে আপনার কোন আশঙ্কা নেই।'

মধুরভাষিণী তারাদেবী বললেন, 'ভদ্র, আপনাদের পরিচয় আমি পূর্বাহ্নেই সংগ্রহ করেছি। আপনাদের বিপদের কথাও শুনেছি। আমি এই দেশের অধিপতি মহাবল বালীর প্রধানা রমণী। এ অধীনার নাম তারা।'

রামচন্দ্রের অনিন্দ্যসুন্দর মুখকান্তি সংশয়-মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠল। তিনি ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বললেন, 'আপনি চরের মুখে আমাদের সকল সংবাদ সংগ্রহ করেছেন! আশ্চর্য! আপনার, না এদেশের শাসন-ব্যবস্থা ই এমন নিপুণ সংবাদ-সংগ্রহ ব্যবস্থা ?'

'এদেশের শাসক নিজের দৈহিক বলদর্পে নিশ্চিন্ত হয়ে নক্ষত্র-পরিবৃত চন্দ্রের মতো রমণী ও সুরায়, আনন্দকৌতুকে দিনযাপন করছেন। যাঁরা প্রকৃত শাসনকার্য পরিচালনা করতেন, তাঁরা নিজেদের ভাগ্যদোষে, বিনা অপরাধে সুগ্রীবের সঙ্গে নির্বাসিত, এই ঋষ্যমূক পর্বতের চতুঃসীমায় বন্দী।'

'তবে ?' প্রশ্নটা শেষ করতে পারেন না রামচন্দ্র, ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রেই চেয়ে থাকেন।

'আমি নিজেই কিছু বার্তা-সংগ্রাহক পালন করি। আপনাদের আগমন ও পরিচয় আমি পেয়েছি অপর এক গুপ্তচরীর মুখে। দুই নিষাদের সঙ্গে কথোপকথন প্রসঙ্গে আপনাদের বিপদ ও অপরিমেয় দুঃখ-বেদনার কাহিনী শ্রবণ করেছে আমার সঙ্গের এই বালিকাটি। এই বৃক্ষেরই এক শাখায় বসে সব শুনেছে সে। এর দেহ এতই লঘু, শাখামৃগীর মতোই এর গতিবিধি—সেজন্য আপনারা বিন্দুমাত্র কোন শব্দ পান নি। এমন কি যখন নেমে চলে গেছে, তখনও না।'

তারাদেবী এই পর্যন্ত নিজেদের পরিচয় এবং এখানে আগমনের

এইটুকু যোগাযোগ জানিয়ে নীরবে ঈষৎ উৎসুক মুখে রামচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তিনিও যেন এই আর্য যুবকটিকে বোঝার চেষ্টা করছেন। এ কতটা বিশ্বাসযোগ্য বা নির্ভরযোগ্য, এর বুদ্ধির গভীরতা কতখানি।

রামচন্দ্রও তাঁর আয়ত নেত্রের স্থির দৃষ্টি তারার আননের উপরই নিবদ্ধ রেখেছেন।

এভাবে পরনারীর মুখের দিকে চেয়ে থাকা হয়ত অভব্যতা, কিন্তু এ নারী এই গভীর রাত্রে নিজেই এসে দাঁড়িয়েছেন, নিজের মুখাবরণ উন্মোচন করেছেন—কোন বিশেষ বার্তা এনেছেন নিশ্চয়ই—কোন বিশেষ প্রস্তাব—এঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে দোষ নেই।

তাঁরও এঁকে বোঝা প্রয়োজন—তুলাদণ্ডের মাপে এঁর মনের গতি তৌল করা।

অল্পক্ষণ পরে রামচন্দ্র বললেন, 'আপনি যখন সবই অবগত হয়েছেন, তখন অধিক ভূমিকার প্রয়োজন নেই। আপনি কি ঐ নিষাদদের অভিমতই সমর্থন করেন? আমাদের কি তাহলে বালীর সহায়তা লাভের চেষ্টা করাই কর্তব্য?'

'কদাচ না।' তারাদেবীর কণ্ঠস্বর এখনও যেন সর্পিণীর মতোই গর্জন করে উঠল, 'সেইজন্যই তো নিষাদদের পরামর্শ শ্রুতিগোচর হওয়ামাত্র আমি লজ্জা ও ভয় বিসর্জন দিয়ে এই অন্ধকার রাত্রে বিপজ্জনক পথে ছুটে এলাম। বালীর আশ্রয় গ্রহণ করতে গেলে অধিকতর বিপদে পড়বেন। সর্বনাশের যা সামান্য অবশিষ্ট আছে তাও থাকবে না। বালীই আপনাদের বন্ধন ক'রে সেই রাক্ষসের হাতে সমর্পণ করবেন। শুনলাম আপনারা সে অপহরণকারীর নাম কোন বৃদ্ধের মুখে শুনেছেন—রাবণ, কিন্তু তার পরিচয় বা গতিবিধি জানেন না। আমি জানি। রাবণ লঙ্কার রাজা, রাক্ষস জাতির মধ্যে সর্বাধিক পরাক্রান্ত। সে লঙ্কার অধীশ্বর বটে, তবে এই বিশাল জম্বুদ্বীপের সর্বত্র তার গতিবিধি। সে কুবেরের বৈমাত্র ভ্রাতা—কিন্তু কুবেরের ঐশ্বর্য, এমন কি তাঁর পুষ্পক

রথ পর্যন্ত বাহুবলে করায়ত্ত করেছে। আকাশপথে তার গতিবিধি, কখনও কৈলাসে, কখনও মলয় পর্বতে—ইচ্ছামতো বিহার করে। সে প্রবলপ্রতাপ, বোধ করি দেবতারাও তাকে ভয় করেন। কেবল একবার রাবণ বালীর সঙ্গে স্পর্ধা প্রকাশ করতে গিয়েছিল, তাঁকে জয় করতে পারে নি। দীনতা স্বীকার ক'রে মুক্তি পেয়েছিল। সেই হতে দু'জনার নিবিড় সখ্য। রাবণ সব দেশ থেকে বলপূর্বক রাজপ্রাপ্য আদায় করে, কেবল কিষ্কিন্ধ্যায় কদাচ আসে না।'

বিস্মিত রামচন্দ্র বললেন, 'কিন্তু আপনি বালীর প্রধানা মহিষী, তার ভার্যা, আপনি এইসব সংবাদ দিতে এসেছেন, এত রাত্রে এই শ্বাপদ ও তাদের থেকেও ভয়ঙ্কর হিংস্রপ্রাণী-সমাকীর্ণ বনপথে! এর অর্থ আমি এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।'

'প্রধানা মহিষী ঠিকই।' অবজ্ঞায় ও ব্যঙ্গে তারার মুখ বিকৃত হয়ে ওঠে, 'এখনও আমি পদবীতে ওঁর সঙ্গিনীদের মধ্যে অগ্রগণ্যা। যুবরাজ অঙ্গদ আমারই গর্ভজাত। তবে ভার্যা বা স্ত্রী বলতে আপনারা যা বোঝেন—ক্ষমা করবেন, বহু দূর দেশে চর প্রেরণ ক'রে আমি আপনাদের রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠানের যে বিবরণ সংগ্রহ করেছি—আমাদের এখানে তেমন কোন অনুষ্ঠান বা প্রথা নেই, এক একজনের এক একটি রমণী চিহ্নিত থাকে এই পর্যন্ত। সে-ই তার স্ত্রীর কার্য করে। মানে আপনারা যাকে স্ত্রী বলেন তেমনি। আপনারা বহুবিবাহের দ্বারা একাধিক রমণী সম্ভোগের ব্যবস্থা রেখেছেন, আমাদের এখানে পুরুষরা একাধিক রমণী এমনিই গ্রহণ করে ইচ্ছা হ'লে। মেয়েদেরও তেমনি সে স্বাধীনতা আছে।'

এই পর্যন্ত বলে তারা কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন।

ধীরে ধীরে ঈষৎ বেদনা-আবেগ-কম্পিত স্বরে বলতে লাগলেন— 'আমার নিজের ব্যথা দিয়ে—স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা অবহেলিতা হওয়ার অবমাননা, একা একা দিনরাত্রি কাটানোর যন্ত্রণা দিয়ে বুঝি আপনার স্ত্রী কত সৌভাগ্যবতী। আপনি তাঁকে এত ভালবাসেন, তাঁর

বিরহে প্রায় উন্মাদ হয়ে তাঁর সন্ধানে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, অন্য নারী দ্বারা কাম চরিতার্থ করার চেষ্টা করেন নি—তিনিই আপনার ধ্যানজ্ঞান—আমার কাছে এর থেকে কোনো সৌভাগ্য অকল্পনীয়। সেই জন্যই আপনার জন্য আমার এত সহানুভূতি, আপনার প্রতি আমার এত শ্রদ্ধা। সেই কারণেই আমার এ দুঃসাহসও। প্রায় অভিসারিকার মতোই ঘন অরণ্য ভেদ ক'রে ছুটে এসেছি পথের বিপদ কি কষ্টের কথা চিন্তা না ক'রে। আপনি যাতে আপনার প্রিয়তমা স্ত্রীকে উদ্ধার করতে পারেন, আপনার মর্মান্তিক দুঃখ দূর হয়, আপনি যাতে সুখী হতে পারেন, আর আপনার সঙ্গে মিলিত হতে পারে আপনার ভাগ্যবতী স্ত্রীও—সেই আমার এখন যেন একমাত্র চিন্তা।'

তারপর একটু সময় নিয়ে যেন নিজের আবেগ দমন ক'রে অধিকতর গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বললেন, 'বালীর কাছে গিয়ে পড়লে স্ত্রীকেও উদ্ধার করতে পারবেন না। উপরন্তু নিজেরাই তাঁর হস্তে বন্দী হবেন। ছলনার দ্বারা বন্ধন ক'রে রাবণের হাতে অর্পণ করবেন। তদুপরি আপনার স্ত্রী যদি সত্যই খুব রূপবতী হন, বালী তাঁকে হরণ ক'রে এনে নিজ অন্তঃপুরভুক্ত করবেন। রাবণও সাহস করবেন না ওঁকে বাধা দিতে।'

'শুচিস্মিতে', রাম অভয় হাস্যে বলেন, 'আপনার এই উৎকণ্ঠা, আমার স্ত্রী সম্বন্ধে সস্নেহ উক্তিতে আমি কৃতার্থ বোধ করছি। তবে আপনিও নিশ্চিন্ত থাকুন, বালী যত বড় শক্তিমানই হোন, দাশরথির হস্তে ধনুর্বাণ বা অসি থাকতে তাঁর সাধ্য নেই আমাদের বন্দী করেন।'

'কিন্তু তিনি যদি কপটাচারের সাহায্য নেন? সখ্যের ছল ক'রে সমাদরে গৃহে নিয়ে নিদ্রিত অবস্থায় বন্দী করেন? তদ্ব্যতীত আপনি কি তাঁর সঙ্গে একক দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয়ী হতে সক্ষম হবেন? তিনি নিরস্ত্র দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করলে আপনার পক্ষে অস্ত্র দ্বারা বধ করা তো সম্ভব নয়।'

'কেন নয়?' পিছন থেকে লক্ষ্মণের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ এবার শোনা যায়, 'হিংস্র জন্তুদের কি আপনারা অস্ত্র, প্রস্তর অথবা অগ্নির সাহায্যে বধ

করেন না? হস্তপদাদির সাহায্যে তাকে বশীভূত করার চেষ্টা করেন? কখনও কখনও কৃত্রিম গুহার সৃষ্টি ক'রে উপরে সামান্য পত্রপল্লব দিয়ে আহার্যের লোভ দেখিয়ে শ্বাপদদের এনে বন্দী করেন এবং তারপর সেই অসহায় আকস্মিক-বন্দীদশাপ্রাপ্ত পশুদের কি দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করেন, না তৎক্ষণাৎ বধ ক'রে নিশ্চিন্ত হন? বালীর যেরূপ প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি, কেবলমাত্র পশুবলই যার সম্বল, তাতে সে যে ব্যাঘ্র ঋক্ষ সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর প্রাণী এমত তো বোধ হচ্ছে না তাকে।'

রামচন্দ্র অনুজকে বাধা দিয়ে শান্ত কণ্ঠে তারাদেবীকে প্রশ্ন করলেন, 'ওসব কথা এখন থাক সৌমিত্রি। চারুশীলে, আপনি আমাদের এখন কি করতে বলেন?'

'আপনি সুগ্রীবের সঙ্গেই মিত্রতা স্থাপন করুন। তাঁকে বন্ধুরূপে সাহায্য ক'রে তাঁকে বালীর প্রতিশোধ আকাঙ্ক্ষা থেকে ত্রাণ করলে কিষ্কিন্ধ্যার সমস্ত নরনারী আনন্দের সঙ্গেই সুগ্রীবকে তাদের অধিপতি বলে স্বীকার করবে। তখন তাঁর পক্ষে রাবণের আবাস অন্বেষণ করা, কি সীতার অবস্থা ও অবস্থানের সংবাদ সংগ্রহ করা সুসাধ্য হবে। তিনিই এ রাজ্যের যুদ্ধপটু বানরবাহিনীসহ আপনার সঙ্গী হতে পারবেন। সুগ্রীব সদাচারা, সত্যবাদী, সুসভ্য। তদুপরি, কিষ্কিন্ধ্যার যাঁরা কর্মদক্ষ, বুদ্ধিমান, সৎ রাজকর্মচারী, তাঁরা প্রায় সকলেই সুগ্রীবের সহচররূপে নির্বাসিতের জীবন-যাপন করছেন। তাঁরা মুক্তিলাভ করলে আপনাকে যথেষ্ট সাহায্য করতে ও সৎপরামর্শ দিতে পারবেন। আপনি যত বড় বীর ধনুর্ধরই হোন, একা কী সেই রাক্ষসপুরী ধ্বংস করতে বা তাদের দমন করতে পারবেন?'

'দেবী, আপনি সুখী ও সৌভাগ্যবতী হোন। ঈশ্বর আপনার কল্যাণ করুন। আপনার উপদেশ শুনে মনে হচ্ছে, আমার এই দুঃখ দেখে অবশেষে স্বয়ং দেবতারা এক দেবদূতী প্রেরণ করেছেন। আপনার সহানুভূতিসম্পন্ন মিষ্ট বাক্য ও পরামর্শে আমি যথেষ্ট আশ্বাস ও সান্ত্বনা লাভ করলাম। মনে আশারও আলোক দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ভদ্রে,

বালীর অনিষ্ট হ'লে আপনার ক্ষতি হবে না? আপনার দুঃখের কারণ ঘটবে না?'

শুষ্ক পত্রাদির প্রজ্বলন্ত বহ্নির আলোক ম্লান হয়ে এসেছে। এখন শুধু বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ডগুলির অগ্নি ও অঙ্গারের যা আভা—তবু তাতেও রাম এবং অন্তরালবর্তী মহাবীর দেখতে পেলেন, তারার দুটি মাদকতাময় চক্ষুতে মুহূর্তের মধ্যে কি বিদ্যুৎ ঝলকিত হ'ল।

তিনি স্পষ্ট ও কঠিন স্বরে বললেন, 'সে সম্ভাবনা না থাকলে আপনাদের এই সুপরামর্শ দিতে ছুটে আসব কেন? বালীর সঙ্গে দীর্ঘদিনই আমার কোন প্রণয়ের সম্পর্ক নেই। বোধ করি তিনি আমাকে ভুলেই গেছেন। না, বালী না থাকলে এখন যেভাবে দিন কাটাচ্ছি, তার থেকে দুঃখে কাটবে না।'

রাম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'বেশ! তবে সুগ্রীবের সঙ্গে কোথায় যোগাযোগ হবে, কী ভাবে তাঁর দেখা পাব?'

'আমার মনে হয়, তিনিও নিশ্চয় আপনাদের আগমনের সংবাদ পেয়েছেন, লক্ষ্যও রাখছেন। আপনাদের অভিপ্রায় অনুকূল বুঝলে তিনিই সম্ভবতঃ যোগাযোগের ব্যবস্থা করবেন। না হয় আমিই প্রত্যুষে তাঁকে সংবাদ প্রেরণ করব। এই বালিকাই কোন কোন দিন সূর্য উদয়ের পূর্বে ওর পিতামহর নিকটে যায়, সে-ই আপনার এ মনোভাব ও সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেবে।'

তারা আর বিলম্ব করলেন না। আনত হয়ে করজোড়ে নমস্কার জানিয়ে নিমেষমাত্রে সেই মলিন বহির্চ্ছদটি তুলে নিয়ে ঘনীভূত অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

॥ সাত ॥

মহাবীর হনুমান অন্তরাল থেকে তারার এই অপূর্ব কথনভঙ্গী, কণ্ঠস্বরের বিষয়োপযোগী আশ্চর্য পরিবর্তন, যুক্তি ও বুদ্ধির বিস্ময়কর মিলন দেখে মুগ্ধ, অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন।

মনে মনে অজস্র সাধুবাদ দিচ্ছিলেন তিনি মহাদেবী তারাকে। এবং সেই অনুপাতেই এই অমূল্য রত্ন অবহেলায় হারাবার জন্য বালীকে ধিক্কার দিচ্ছিলেন। বালী যদি এই রাজ্যের সম্পূর্ণ শাসনভার তাঁর এই প্রধানা সঙ্গিনীর উপর ন্যস্ত করতেন, তাহলে এ রাজ্যের অনেক উন্নতি ঘটত। অনেক শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ হ'ত এ দেশ।

সময় অনুকূল, ভূমি তো তারাদেবীই প্রস্তুত ক'রে দিয়ে গেলেন।

তবে সেইজন্যই আরও—তখনই ওঁদের সম্মুখে যাওয়া যায় না।

মহাবীর আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করলেন।

তবে অধিককাল বিলম্ব করতেও হ'ল না। বন্যকুক্কুট প্রভৃতি সদ্যনিদ্রোত্থিত পক্ষীরা অল্প কিছু পরেই কলরব ক'রে উঠে নিশা অবসান ঘোষণা করল।

আরও কিছু পরে নিবিড় বনান্ধকার ভেদ ক'রে ঊষার আবির্ভাব বার্তা ফুটে উঠল বহ্নি-সমুদ্ভূত আলোকের পাণ্ডুর হয়ে যাওয়ায়।

এ-ই যথা সময়।

মহাবীর বৃদ্ধজনোচিত কণ্ঠশ্লেষ্মা অপসারণের শব্দ এবং হস্তস্থিত যষ্টির শব্দ করতে করতে এবার ওঁদের সম্মুখে এলেন।

যেন পথে যেতে যেতে অগ্নি দেখে নিতান্ত কৌতূহল-ভরেই দুই পা এদিকে চলে এসেছেন।

অতঃপর কিছুক্ষণ দুই চক্ষুর উপর হাত দিয়ে—বার্ধক্যের অভিনয় সম্পূর্ণ করা প্রয়োজন—ওঁদের নিরীক্ষণ করার চেষ্টা ক'রে ব্রাহ্মণোচিত আশীর্বাদের অভয় মুদ্রার ভঙ্গী করলেন। বললেন, 'বীরগণ, তোমরা কে? কোথা থেকে আসছ? তোমাদের বর্ণ উজ্জ্বল, কান্তি সুকুমার। তোমাদের তো দেখছি ব্রতপরায়ণ তাপস বা ব্রহ্মচারীর বেশ। অথচ আকৃতি রাজসদৃশ। বরং দেবতুল্যও বলা যায়। তোমরা এই গহন অরণ্যে কিসের বা কার অন্বেষণে এসেছ? তোমাদের প্রকৃত বৃত্তি কি? তোমরা চিরধারী সন্ন্যাসী, তথাপি তোমাদের দেহপ্রভায় এই বনস্থলী,

ঐ নদীতীর যেন উজ্জ্বল, জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে। তোমাদের দেখছি বন্য হিংস্র জন্তু সম্বন্ধে আশঙ্কামাত্র নেই। মনে হয়, তাদের পূর্বেই বশীভূত করেছ অথবা তেমন সকলকে বধ করেছ। তোমাদের স্কন্ধ-বিলম্বিত শরাসন দেখলে ইন্দ্রেরও আশঙ্কা জন্মাবে। তোমরা সিংহবৎ স্থির নেত্রে চারিদিক অবলোকন করছ। তত্রাচ তোমাদের দেখে এবং ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দে অবসাদগ্রস্ত ও বিষণ্ন বোধ হচ্ছে। তোমরা সভ্য লোকালয়ে অবস্থান বা বিহারেরই যোগ্য, এই বনের মধ্যে কী কারণে এসেছ? তোমরা কি দেবলোক থেকে এখানে এসেছ? তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে, যেন সূর্য ও চন্দ্রই এই বনান্ধকারে আত্ম-গোপনের চেষ্টা করছেন। তোমাদের কোদণ্ড স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত, সুবর্ণ-খচিত বজ্রের মতো মনোহারী ভয়ঙ্কর বোধ হচ্ছে। পৃষ্ঠের তূণীরগুলি প্রাণান্তকর অগ্নিময় সর্পসদৃশ সুশাণিত অস্ত্রে পূর্ণ। তোমাদের দীর্ঘ খড়্গ করীশৃঙ্গবৎ ভুজদণ্ডেরই উপযুক্ত। তোমরা দুই মহাবীর কি সাগর-বন-পর্বতপূর্ণ দুই মেরুমধ্যবর্তী পৃথিবীকে জয় করতে বেরিয়েছ?'

অকস্মাৎ প্রাক্-প্রভাত কালে এই অদ্ভুতদর্শন বৃদ্ধকে দেখে ও তাঁর মুখে কাব্যানুরূপ বাক্যবিন্যাস শুনে দুই রাজকুমার এতই বিস্মিত হয়ে পড়েছিলেন যে, তখনই কোন উত্তর দিতে পারলেন না। বিমূঢ়বৎ নিঃশব্দে চেয়েই রইলেন।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে থেকে মহাবীর পুনশ্চ বললেন, 'কী, তোমরা আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন? তোমাদের কি পরিচয় দানে কোন বাধা আছে? বেশ, আমিই নিজের পরিচয় দিচ্ছি। এই ঋষ্যমূক পর্বতে সুগ্রীব নামে এক বীর বাস করেন। তিনিই এই রাজ্যের প্রজা-সাধারণ নির্বাচিত প্রকৃত অধিকারী, ধর্মপরায়ণ, সৎস্বভাব ব্যক্তি। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত, নির্বাসিত করেছেন এবং তাঁর রমণীকেও হরণ করেছেন। এজন্য একান্ত দুঃখিত মনে তিনি এখানে কালযাপন করছেন। আমি তাঁরই এক মন্ত্রী। তাঁর আজ্ঞামতোই এখানে এসেছি। আমার নাম হনুমান। সুগ্রীব তোমাদের মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ

করতে আগ্রহী। সেই কারণেই ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের বেশে আমার এখানে আগমন। এবার তোমাদের কথাও কিছু অবগত হতে চাই।'

রাম সরাসরি মহাবীরকে উত্তর না দিয়ে লক্ষ্মণকে সম্বোধন করে বললেন, 'বৎস, আমরা সুগ্রীবেরই অন্বেষণ করছিলাম। সৌভাগ্যবশতঃ তাঁরই এক মন্ত্রী আমাদের কাছে এসেছেন। এ দৈবেরই যোগাযোগ। এই মন্ত্রীবর বীর, বুদ্ধিমান ও সুবক্তা। তুমি এঁর সঙ্গে আলাপ করো। ইনি যেভাবে কথা বলছেন, তাতে মনে হচ্ছে তিনি এদেশবাসী হলেও ওঁর তিন বেদে সম্পূর্ণ অধিকার আছে এবং আর্য ভাষার সমগ্র ব্যাকরণ ইনি অবগত হয়েছেন। ইঁনি বিস্তর কথা বললেন, কিন্তু একটিও অপশব্দ ব্যবহার করেন নি। এঁর বাক্যগুণে ইনি আসন্ন বধোদ্যত নিষ্ঠুর আততায়ীর মনও প্রসন্ন করতে পারেন। তুমি এঁর কাছে আমাদের পরিচয় দাও এবং এখানে আসার কারণ বলো।'

লক্ষ্মণ অগ্রবর্তী হয়ে নমস্কার জ্ঞাপনান্তে সংক্ষেপে এখানে আসার হেতু বিবৃত করলেন।

নিঃসন্তান রাজা দশরথের বৃদ্ধবয়সে চারিটি পুত্র হয়। তার মধ্যে এই রাম জ্যেষ্ঠ, ভরত মধ্যম, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন তৃতীয় ও চতুর্থ। রাম প্রধানা মহিষী কৌশল্যার গর্ভজাত, ভরত কেকয়রাজনন্দিনী কৈকেয়ীর পুত্র। ওঁরা দুজন সুমিত্রা নাম্নী তৃতীয়া মহিষীর।

রাম বয়োপ্রাপ্ত হলে দশরথ তাঁর উপর রাজ্যের শাসনভার অর্পণ ক'রে অবসর নিতে চেয়েছিলেন। সকলেই তাতে আনন্দিত। কারণ রাম সকলেরই প্রিয়। কিন্তু শেষ মুহূর্তে বিমাতা কৈকেয়ী দশরথের নিকট বহুদিনের প্রতিশ্রুত দুটি বর প্রার্থনা করলেন— এক বরে রামচন্দ্র চীরবল্কলধারী হয়ে চতুর্দশ বৎসরের জন্য বনে যাবেন, দ্বিতীয় বরে ভরত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবেন।

রাজা দশরথ মর্মাহত হলেও এর অন্যথা করতে পারলেন না। তিনি বহু দিনের সত্যবদ্ধ। অগত্যা সেই মতোই আদেশ দিতে বাধ্য হলেন। ভরত তখন মাতুলালয়ে ছিলেন। তাঁর কাছে দূত প্রেরিত হ'ল। তবে

রাম আর সেজন্য অপেক্ষা করলেন না। কারণ তিনি জানতেন, ভরত কখনই এতে সম্মত হবেন না। তা ছাড়া তিনি যতদিন থাকবেন, দশরথের আত্মগ্লানির সঙ্গে লজ্জাও যোগ হবে। তিনি সেইদিনই বল্কল ধারণ ক'রে বনে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। তবে উনি একা আসতে পারেন নি, স্ত্রী সীতা বা জানকী এবং ভ্রাতা লক্ষ্মণ স্বেচ্ছায় প্রায় রামচন্দ্রের অমতেই সঙ্গে এসেছিলেন।

সেই শোকে-দুঃখে দশরথ অল্প ক'দিনের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করেন। ভরত এসে প্রথমে রাজ্যভার নিতে চান নি। রামকে ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিলেন। কিন্তু রাম অনেক বুঝিয়ে ওঁকে নিরস্ত করেন। এই চতুর্দশ বৎসর গত হবার পূর্বেই তিনি যদি ফিরে গিয়ে সিংহাসনে বসেন, দশরথ মিথ্যাবাদী হয়ে যাবেন না কি? ভরত এই চৌদ্দ বৎসর ওঁর প্রতিনিধি হয়েই রাজ্যশাসন করুন।

ভরত তখনকার মতো বিষণ্ণ চিত্তে ফিরে গেলেন। পাছে আবার এইরূপ চেষ্টা হয়, এই আশঙ্কায় ওঁরা আরও দক্ষিণে সুদূর দণ্ডকারণ্যে চলে এলেন এবং শেষ পর্যন্ত ঐ বনের প্রান্তভাগে পঞ্চবটী নামে একটি রমণীয় স্থানে আশ্রম নির্মাণ ক'রে বাস করতে লাগলেন। সেখানে স্বচ্ছতোয়া কলস্বিনী নদী, নানাবিধ পুষ্পপ্রসূ বৃক্ষ, বনজ ফলমূল ও কুক্কুট-মৃগমাংস প্রভৃতির প্রাচুর্য থাকায় স্থানটি ওঁদের খুবই মনোরম বোধ হয়েছিল।

সুখেই ছিলেন ওঁরা। বস্তুতঃ রাজসুখভোগের সঙ্গে নানারূপ অশান্তি থাকে—এখানে অনাবিল শান্তি। বিপদ ও এই দারুণ অশান্তি দেখা দিল একেবারে শেষের দিকে, মাত্র কিছুদিন পূর্বে। আর সে বিপদ ও বিসম্বাদ ঘটল লক্ষ্মণকে উপলক্ষ ক'রেই।

ওঁরা যে কদর্য জীবনযাপনকারী আমমাংসভোজী নিম্নশ্রেণীর অনার্যদের রাক্ষস নামে অভিহিত করেন, সেই জাতীয়া একটি নারী, বীভৎসদর্শনা—সূর্পনখা নাম—একদা বনমধ্যে লক্ষ্মণকে দেখে কামার্ত হয়ে বিবাহের প্রস্তাব করল। স্বভাবতঃই লক্ষ্মণ সম্মত হলেন না। তাঁর স্ত্রী আছে,

তাও জানালেন। কিন্তু সে স্ত্রীলোকটি তখন এমনই অধীর হয়ে উঠেছে যে, বলপূর্বক ওঁকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করতে গেল। লক্ষ্মণ অল্পবয়স্ক, তাঁর ক্রোধ ও ঘৃণা দুইই অধিক। তিনি ঐ স্ত্রীলোকটার নাসাকর্ণ ছেদন ক'রে তাকে আরও বীভৎসাকৃতি ক'রে দিলেন।

সূর্পনখা কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে নিকটে তার যে সব আত্মীয়রা ছিল, তাদের সংবাদ দিল। তারা ক্রুদ্ধ হয়ে সদলবলে এল রাম-লক্ষ্মণকে বিনাশ করতে, ওঁদের কোমল মাংস শল্যপক্ক ক'রে আহার করবে বলে। কিন্তু তারা সংখ্যায় অধিক হলেও তাদের অস্ত্র বলতে কিছু ছিল না। প্রধানতঃ বাহুবল ও ছলনাই ভরসা। অধিকন্তু বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ও বৃক্ষ। এঁদের সঙ্গে নানাবিধ প্রাণঘাতী শাণিত অস্ত্র, বিশেষ ভয়ঙ্কর আগ্নেয়াস্ত্র— তার সামনে ওরা দাঁড়াতে পারবে কেন? বেশির ভাগই নিহত হ'ল। কিছু কোনমতে প্রাণ নিয়ে পলায়ন করল। সূর্পনখা এঁদের এতখানি শক্তির কথা কল্পনাও করতে পারে নি। সে এবার ভয় পেয়ে কোথায় তার ভাই রাক্ষসরাজ রাবণ আর পর্বতাকার কুম্ভকর্ণ আছে—তাদের সংবাদ দিল। এটা এঁদের অনুমান, সঠিক জানেন না। জটায়ু নামে এক বৃদ্ধ রাজা দশরথের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তিনিই, রাবণ একটি বধূকে হরণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছে দেখতে পান, সীতা ক্রন্দনের মধ্যেই নিজের পরিচয় দিচ্ছিলেন, যদি কেউ শুনতে পায় তো কোনদিন রাম সংবাদ পাবেন এই আশায়। জটায়ু বাধা দেবারও চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু রাবণ তাঁকে নিদারুণ প্রহার ক'রে প্রায় হতচেতন ক'রে অনায়াসেই সীতাকে নিয়ে চলে যায়।

রাম-লক্ষ্মণ যখন ইতস্ততঃ সীতাকে অন্বেষণ করতে করতে ওঁর কাছে আসেন, তখন জটায়ুর শেষ অবস্থা। সে বৃদ্ধ মৃত্যুর পূর্বে শুধু এই কথাটি বলতে পেরেছিলেন—রাক্ষসরাজ রাবণ সীতাকে হরণ ক'রে নিয়ে গেছে।

এখন মনে হয়, রাবণ জাদুবিদ্যা জানত। তারই মায়াজালে সীতা দেখেন একটি সুন্দর স্বর্ণমৃগ তাঁদের কুটিরের কাছে বিচরণ করছে।

তিনি রামকে অনুরোধ করেন হরিণটি ধরে দিতে। রামকে দেখে হরিণ ছুটতে থাকে, রামও তার অনুসরণ ক'রে বহুদূরে গিয়ে পড়েন। এদিকে দীর্ঘকাল অদর্শনে তাঁর বিপদ আশঙ্কা ক'রে লক্ষ্মণও তাঁর সন্ধানে যান। মনে হয়, নিকটেই কোথাও সে দুর্বৃত্তটা আত্মগোপন ক'রে ছিল। ওঁদের কুটির-সীমা থেকে নির্গত হতে দেখেই এসে ধরে নিয়ে গেছে সীতাকে।

দীর্ঘ ইতিহাস শেষ হ'ল যখন—সূর্য বেশ খানিকটা উঠে গেছেন। নিবিড় বনানীর ঘন পত্রপল্লব ভেদ ক'রেও দিন দেখা দিয়েছে স্পষ্ট হয়ে।

এঁদের দুঃখের কাহিনীতে আর্দ্রচিত্ত মহাবীর গদ্‌গদ কণ্ঠে বললেন, 'আমার মনে হয়, আজকের এই প্রভাতসূর্য একই সঙ্গে তোমাদের ও সুগ্রীবের সৌভাগ্যসূর্য রূপে উদিত হয়েছেন। সুগ্রীবের দুর্ভাগ্যের অবসান আসন্ন বলেই তোমরা এই ঘোর দুঃখে নিপতিত হয়েছ। আর তোমাদের সে দুঃখ-রজনী প্রভাত হওয়া আসন্ন বলেই তোমরা এখানে এসে পড়েছ। চলো, আর কালবিলম্বে প্রয়োজন নেই। আমরা এখনই সুগ্রীবের নিকটে যাই।'

॥ আট ॥

সুগ্রীব আদ্যোপান্ত সমস্ত ইতিহাস শ্রবণ ক'রে কিছুক্ষণ কি চিন্তা করলেন, তার পর বললেন, 'এখন আমার বোধ হচ্ছে সেদিন আকাশ-পথে যাঁর আর্তনাদ ও বিলাপ শুনেছি, তিনিই আপনার স্ত্রী জানকী। তখনই বুঝেছিলাম, কোন দুর্বৃত্ত এক ভদ্র গৃহস্থবধূকে হরণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমার তো কিছু করার ছিল না। ওরূপ উড্ডীয়মান যান পূর্বে কখনো দেখিও নি। এমন যে হয় তাও জানি না। তদ্ব্যতীত—আমি তো প্রকৃতপক্ষে এখানে বন্দী।'

তারপর কিছুক্ষণ যেন কী স্মরণ করার চেষ্টা ক'রে বললেন, 'তবে তিনি বোধ করি আপনাদেরই উদ্দেশে—মানে রাক্ষসটা কোন্ দিকে নিয়ে যাচ্ছে, উনি কোন্ পথে যাচ্ছেন জানাতেই—কিছু কিছু অলঙ্কার

ফেলে গিয়েছিলেন। সেগুলি আমি যত্ন ক'রে তুলে রেখেছি। একটু অপেক্ষা করুন, আপনাদের তা দেখাচ্ছি। নিশ্চয় আপনারা চিনতে পারবেন।'

বলতে বলতে তিনি উঠে গিয়ে গুহাকক্ষের অভ্যন্তর থেকে কেয়ূর, কঙ্কণ ও নূপুর এনে দেখালেন।

সেগুলি দেখামাত্র প্রায় টেনে নিয়ে সবলে বুকে চেপে ধরে রামচন্দ্র হাহাকার ক'রে কেঁদে উঠতে আর চিহ্নিত করার কোন প্রশ্নই রইল না।

লক্ষ্মণের চক্ষুও শুষ্ক ছিল না।

তিনিও প্রথমটা অধিকতর দুঃখে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন।

ওঁদের সচেতন করলেন মহাবীরই।

বেশ একটু কঠিন স্বরেই বললেন, 'পুরুষ এবং বীর—বিশেষ আপনারা ক্ষত্রিয় সন্তান—এঁরা কখনও রোদন করেন না। এঁদের চোখে জল থাকে না, থাকে অগ্নি। অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণ পুরুষের কাছে ধর্মাচরণ। এখন আর বৃথা কালক্ষেপে প্রয়োজন কি? যত শীঘ্র সম্ভব সে পাপাচারীর অনুসন্ধান ও মাতা জানকীর উদ্ধারকার্য আরম্ভ করা যায় ততই মঙ্গল।'

এই এক কথাতেই রাম ও লক্ষ্মণ দু'জনেই শোক পরিহার ক'রে প্রকৃতিস্থ হলেন।

রাম সুগ্রীবকে প্রশ্ন করলেন, 'এক্ষণে আপনিই বলুন, আপনার কোন্ প্রিয় কার্য সম্পাদন করলে আপনি আমাদের সাহায্য করতে পারেন?'

সুগ্রীব বললেন, 'দেখুন, এক্ষেত্রে বৃথা বাক্যজাল বিস্তার বাঞ্ছনীয় নয়। আমি যা বলছি, তাতে ঠিক কোন শর্ত আরোপ করছি না। প্রয়োজন বলেই বলছি। বালী নিহত না হলে আমি রাজ্য ফিরে পাব না, স্বাধীনভাবে কোন কার্য করাও সম্ভব হবে না। রাজ্য ফিরে না পেলে চর প্রেরণ বা বাহিনী গঠন কিভাবে করব বলুন? আপনি যদি আমার রাজ্যপ্রাপ্তি ও শত্রুনাশের পথ প্রশস্ত ক'রে দেন, বালীরূপ জীবন-

কণ্টক দূর করেন, তা হলেই আমি আপনার দাস হয়ে সেবা করব। প্রাণপাত ক'রেও আপনার কার্য উদ্ধার করব।'

রাম কিছুক্ষণ অবনত মস্তকে চিন্তা ক'রে বললেন, 'কিন্তু বালী তো আমার কাছে কোন কারণে অপরাধী নয়, তাকে বধ করা আমার পক্ষে অধর্ম হবে না?'

এর উত্তর দিলেন মহাবীর। বললেন, 'বালী মৃত জেনে—এক বৎসরেরও অধিক কাল তিনি অদৃশ্য, অজ্ঞাত ও অনুপস্থিত ছিলেন—রাজ্যের প্রধানগণ সর্বসম্মতিক্রমে সুগ্রীবকে শাসকপদে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সুতরাং ন্যায়তঃ ধর্মতঃ এ রাজ্য সুগ্রীবেরই। বালী ফিরে এসে সে ঘটনার সত্যাসত্য নির্ধারণের চেষ্টামাত্র করেন নি, সুগ্রীবকে নির্যাতন ও আমাদের বধ করার সঙ্কল্প ঘোষণা ক'রে বলপূর্বক সুগ্রীবের রমণীকে নিয়ে শয়নকক্ষে চলে যান। সেই থেকেই আমরা এখানে নির্বাসিত। ঋষিশাপে এই স্থান বালীর পক্ষে মৃত্যুজনক, অগম্য, তা না হলে সে আমাদের এতদিন কবে বধ করত। এক্ষেত্রে সুগ্রীবের রাজ্য পুনরুদ্ধার করা কিছুমাত্র অধর্ম নয়, আর আপনি যদি মহামনা সুগ্রীবের সঙ্গে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দ্বারা মিত্রতাবদ্ধ হন, তাহলে সুগ্রীবের সহায়তা করা আপনার অধর্মাচরণ হবে কেন? আমি যত দূর আপনাদের যুদ্ধের রীতিনীতি অবগত আছি, কোন দুই পক্ষে যুদ্ধের কারণ ঘটলে উভয়পক্ষই তাঁদের মিত্ররাজগণকে সাহায্যার্থ আমন্ত্রণ জানান এবং নৃপতিগণও সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করা ধর্ম বলে বোধ করেন—তাই নয় কি?'

রামচন্দ্র বলেন, 'কিন্তু আমি তো কেবল দৈহিক দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারব না ওর সঙ্গে, আমাকে অস্ত্র দ্বারাই ওকে বধ করতে হবে?'

মহাবীর হাস্য করলেন। বললেন, 'আপনাদের আর্যাবর্তে কোন রাজা যখন এক রাজার সঙ্গী বা বন্ধুরূপে যুদ্ধে যোগ দেন, তখন পূর্বাহ্ণে প্রতিপক্ষ কোন্ কোন্ অস্ত্র ব্যবহার করবেন, তা জেনে কেবলমাত্র সেই অস্ত্রগুলিই সঙ্গে নেন, না অধিকতর শক্তিশালী ভয়ঙ্করতর অস্ত্র নেবার

চেষ্টা করেন? আপনি এক দেশের নৃপতি আর এক দেশের ভাগ্যহত নৃপতির সাহায্যার্থে যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছেন—এ কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন?'

রাম কিছুক্ষণ মৌন থেকে বললেন, 'এ যুক্তি মেনে নেওয়া ছাড়া আমার গত্যন্তর নেই। সুতরাং সেই আয়োজনই করুন।'

সুগ্রীব তখনই শুষ্ক পত্র এবং কিছু শুষ্ক বৃক্ষশাখা সংগ্রহ ক'রে, তাতে অগ্নি সংযোগ করলেন। রামচন্দ্র এবং সুগ্রীব দু'জনেই সেই অগ্নিকে প্রদক্ষিণ ক'রে এবং স্পর্শ ক'রে মিত্রতাপাশে বদ্ধ হলেন। সেদিন থেকে দু'জনেই দু'জনের বন্ধু হলেন—আমরণ। বিপদে সম্পদে, উৎসবে শ্মশানে সর্বত্র সর্বদা বন্ধু।

অতঃপর বালী বধের আয়োজন। তবে সে আয়োজনে তখনও একজনের যেন উৎসাহের অভাব।

এত বাক্য বিনিময়ের পরও সুগ্রীব সংশয়পূর্ণ কণ্ঠে বললেন, 'বন্ধু রামচন্দ্র, এখনও সম্যকভাবে অগ্র-পশ্চাৎ চিন্তা করো। বালীর বাহুবল অপরিসীম, অসাধারণ। কারও সঙ্গেই তুলনীয় নয়, কারও ধারণায় সে শক্তির সামগ্রিক রূপ পাওয়া সম্ভব নয়। বোধ করি একটা সুবৃহৎ গিরিশৃঙ্গ উৎপাটিত করে সে গেণ্ডুয়ার মতো ক্রীড়া-বস্তু হিসাবে ক্রীড়া করতে পারে। বহু বলবীর্যশালী ব্যক্তি ওঁকে সাক্ষাৎ শমন বোধে শঙ্কিত থাকেন, দূরে পরিহার করেন।'

রাম সুমধুর হাস্যে ওঁকে অভয় দিয়ে বললেন, 'বন্ধু, দেহের বল যতই অপরিমাণ হোক, অস্ত্রের সঙ্গে তা তুলনীয় নয়। দৈহিক বলের পরীক্ষা হয় সাক্ষাৎ দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে, সে ক্ষেত্রে তিনি আমাকে সহজেই পরাজিত করতে পারবেন। কিন্তু আমার সঙ্গে যা আছে, এ সবই দূরনিক্ষেপী সাংঘাতিক অস্ত্র; বিশেষ আগ্নেয় অস্ত্রগুলি সম্বন্ধে তোমার কোন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাই নেই, পলকপাত মাত্রে তা অনায়াসে অর্ধ যোজন অতিক্রম করে এবং বধ্য ব্যক্তি—সে দূরাগত, সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপী অস্ত্র সম্বন্ধে সচেতন হওয়ারও

পূর্বে, বিপদ আশঙ্কা করার পূর্বেই—নিহত হন। বালীবধ আমাদের কাছে তাই ক্রীড়ার মতোই সহজসাধ্য কাজ।'

তবু সুগ্রীবের সংশয় ও অগ্রজ সম্বন্ধে আতঙ্ক কাটে না।

তিনি বলেন, 'বালী একসঙ্গে সাতটি তাল বৃক্ষ উৎপাটনের শক্তি রাখেন!' `

রাম উত্তর দেন, 'তেমন শ্রেণীবদ্ধ তালকুঞ্জ নিকটে কোথাও আছে?'

মহামান্য নল নীরবে অঙ্গুলি সঙ্কেতে এক সারিতে দণ্ডায়মান সাতটি সুবৃহৎ তাল বৃক্ষ দেখিয়ে দিলেন।

রামও কোন বাক্যব্যয় করলেন না, ধনুঃশর তুলে কিছুদূর পশ্চাদপসরণ ক'রে সেই তালগাছগুলির মধ্যভাগ লক্ষ্য ক'রে একটি তীর নিক্ষেপ করলেন।

শর ধনুচ্যুত হ'ল কিনা, ঘটনাটা কি ঘটছে, সে সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার অবসর পেলেন না বানর-দলপতি সুগ্রীব। তার পূর্বেই সেই শাণিত শরটি একে একে সাতটি তাল বৃক্ষই ভেদ ক'রে বহুদূরের একটি প্রস্তরখণ্ডে গিয়ে প্রোথিত হ'ল!

সুগ্রীব কিছুটা আশ্বস্ত হ'লেও সম্পূর্ণরূপে বুঝি ভীতিমুক্ত হতে পারেন না।

একটু অপ্রতিভভাবে একটা বিশাল শিলাখণ্ড—বোধ করি শতাধিক স্থূলতনু মনুষ্যের তুল্য ওজন হবে—দেখিয়ে বললেন, 'বালী ঐ শিলাখণ্ড তুলে বেশ কয়েক যোজন দূরে নিক্ষেপ করতে পারেন।'

রামচন্দ্র এবারও কোন উত্তর দিলেন না, পরন্তু যেন নিতান্ত অবহেলাভরেই একটি মাত্র শর নিক্ষেপে সে পর্বতাকার প্রস্তর শত খণ্ডে চূর্ণ ক'রে দিলেন।

এবার, রামচন্দ্রের এই প্রায়-অলৌকিক অবিশ্বাস্য শক্তির পরিচয় পেয়ে, বিস্ময়বিহ্বল সুগ্রীব ভূমিলুণ্ঠিত হয়ে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানালেন।

গদ্‌গদ কণ্ঠে বললেন, 'তোমাকে বন্ধু বলতে আর সাহস হচ্ছে না।

তোমার বীর্য ও শস্ত্রদক্ষতা দেখে আমার বোধ হচ্ছে, স্বয়ং ইন্দ্রও তোমার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হবেন। তুমি মনে হয় স্বয়ং ঈশ্বর, আমার দুঃখ দেখে আমাকে ত্রাণ করতে দেহ ধারণ করেছ।'

রামচন্দ্র মধুর হাস্যে ওঁকে বলপূর্বক উঠিয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ ক'রে বললেন, 'কিন্তু তুমি আরও শক্তিমান নয় কি? তোমার ঈশ্বর আজ তোমার শরণাগত?'

সকলের মিলিত মন্ত্রণায় স্থির হয়েছিল, সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যা রাজ-প্রাসাদের বহির্দেশে উপস্থিত হয়ে হুঙ্কার ও আস্ফালন প্রকাশ ক'রে বালীকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করবেন। অহঙ্কারী উদ্ধত বালী অবশ্যই সে আস্ফালন সহ্য করবেন না, তিনি দুর্গের বাহিরে আসবেন ও সুগ্রীবকে সমুচিত শিক্ষা দিতে চাইবেন। এই শ্রেণীর দুই বিপুলকায় ব্যক্তির বাহুযুদ্ধের জন্য প্রশস্ত উন্মুক্ত ও বৃক্ষপাদপ-শূন্য মল্লভূমিও নির্বাচন প্রয়োজন হবে। রামচন্দ্র সেই নির্বাচিত যুদ্ধস্থানের পার্শ্ববর্তী কোন সুবৃহৎ প্রাচীন বৃক্ষছায়ায় আত্মগোপন ক'রে থাকবেন, সুগ্রীব দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে পরাস্ত হচ্ছেন দেখামাত্র উনি শাণিত শরনিক্ষেপে বালীকে বধ করবেন।*

এ সবই রামচন্দ্র ও মহাবীরের যৌথ পরামর্শে স্থিরীকৃত হয়েছিল।

বহু বিবেচনায় ও আলোচনার পর এ পরিকল্পনা গৃহীত হলেও, এ প্রশ্নের একটা দিক উভয়ের কেহই চিন্তা করেন নি।

রামচন্দ্র বালীকে দেখেন নি, মহাবীর দেখেছিলেন। তাঁরই এ সমস্যাটা চিন্তা করা উচিত ছিল।

তিনি সকল সম্ভাবনাই হিসাবে ধরেছিলেন, কেবল একটি তথ্য ছাড়া।

বালী ও সুগ্রীব বলবীর্যে বা প্রকৃতিতে সমতুল্য না হলেও উভয়ের আকৃতি ছিল একই রকম প্রায়। দু'জনে পাশাপাশি থাকলে নিকট

---

* "ঐ সময় রাম ধনুর্ধারণপূর্বক বৃক্ষের ব্যবধানে প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিলেন।"
—বাল্মীকি রামায়ণ।

আত্মীয় বা নিতান্ত অন্তরঙ্গ ব্যক্তি ব্যতীত অপরের পক্ষে কে কোন্‌টি তা অনুমান করা কঠিন হ'ত।

আরও বিপদ হ'ল ওঁদের বেশের সাদৃশ্য।

সুগ্রীব যখন মল্লকচ্ছ পরিহিত অবস্থায় কিষ্কিন্ধ্যা রাজভবনের বহির্দেশে গিয়ে মেঘগর্জনবৎ হুঙ্কার ও আস্ফালন আরম্ভ করলেন, তখন প্রথমটায় বালী বুঝতেই পারেন নি, কার এত সাহস এবং দুর্মতি হ'ল। কারণ সুগ্রীবের এত দুঃসাহস হবে, তা ওঁর স্বপ্নেরও অগোচর। পরে, ওঁর অন্তঃপুরবাসিনীরা এসে সুগ্রীবের আগমন সংবাদ দিলে, ক্রোধে আত্মহারা হয়ে যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থাতেই—অর্থাৎ পরিধানে যে বস্ত্র ছিল, তাকেই মল্লকচ্ছে রূপান্তরিত করতে করতে দুর্গ থেকে বহিষ্ক্রান্ত হলেন এবং সম্মুখে প্রজা সমাবেশের জন্য প্রস্তুত উন্মুক্ত মসৃণ সমতল ভূমিতেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন।

এখানেও সমস্যার কিছুমাত্র সমাধান হ'ল না। কারণ পরিধেয় বস্ত্র দু'জনকারই এক বর্ণের, এক ধরনের। একই ভাবে পরা।

রামচন্দ্র তাঁর প্রতিশ্রুতি মতো পার্শ্বস্থ বনভূমিতে এক সুবিশাল সর্জবৃক্ষের অন্তরালে ধনুর্বাণ হস্তে প্রস্তুত হয়েই অপেক্ষা করছিলেন, কিন্তু কে বালী, কে বা সুগ্রীব, তিনি নির্ধারণ করবেন কিভাবে?

সুগ্রীব যে দণ্ডাধিক কাল বালীর বিক্রম সহ্য করতে পারবেন না—মহাবীর তা জানতেন।

এও জানতেন যে অল্পক্ষণ পরেই সুগ্রীবের কটিদেশ ধরে মৃত্তিকা হতে ঊর্ধ্বে উত্থিত করে বহু দূরের কোন শিলাপট্টে কি শৈলগাত্রে নিক্ষেপ করবেন বালী।

তিনি ত্রাসকম্পিত কণ্ঠে রামচন্দ্রকে প্ররোচিত করতে লাগলেন, 'আর কিছুমাত্র বিলম্ব করবেন না, এখনই আপনার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অস্ত্র নিক্ষিপ্ত করুন।'

রামচন্দ্র নিজেই যথেষ্ট উৎকণ্ঠিত, নিদারুণ লজ্জা বোধ করছিলেন নিজের নিরুপায় নিষ্ক্রিয়তায়।

অথচ কর্তব্য কি, তাও স্থির করতে পারছিলেন না।

তিনি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে মহাবীরকেই প্রশ্ন করলেন, 'অস্ত্র তো নিক্ষেপ করব—কিন্তু কার উপর? যদি বালীর পরিবর্তে মিত্র সুগ্রীবকেই বধ করে বসি? তুমি আমাকে কোনো চিহ্ন বলতে পারো—যাতে আমি সুগ্রীব বা বালী কোন্‌টি কে বুঝতে পারি?'

মহাবীরও এবার বিপন্ন বোধ করেন।

তিনি অবশ্য দু'জনকেই চিনতে পারছেন কিন্তু চিহ্ন কি বলবেন? কিভাবে রামচন্দ্রকে বৈসাদৃশ্যটা বোঝাবেন?

ইতিমধ্যে সুগ্রীব নিস্তেজ ও প্রহারে জর্জরিত হয়ে উঠেছেন। আরও নিগৃহীত বা মৃতকল্প হওয়ার পূর্বেই কোনমতে তিনি অগ্রজের বাহুমুক্ত হয়ে পলায়ন করলেন—একেবারে গভীর বনপথ ধরে ঋষ্যমূকের উদ্দেশে।

বাধাপ্রাপ্ত প্রমোদবিলাস বা প্রমদাসম্ভোগের আকর্ষণ জিঘাংসা কি প্রতিশোধ-স্পৃহা অপেক্ষা অধিক প্রবল বলে বালী আর তখনই পরাজিতের পশ্চাদ্ধাবন করলেন না, তাই রক্ষা। নচেৎ ঐ গুরুতর প্রহৃত অবস্থায় সুগ্রীব দ্রুত ঋষ্যমূকে পৌঁছতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও মহাবীর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওঁর পশ্চাদনুসরণ করছিলেন।

তখন প্রহারে ক্ষত-বিক্ষত, অপমানে মৃতকল্প সুগ্রীব এক বৃক্ষকাণ্ডের উপর হেঁটমুণ্ডে বসে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ত্যাগ করছিলেন। তাঁর দুই চক্ষু নিরুদ্ধ ক্রন্দনে লোহিতাভ। সর্বাঙ্গে বালীর অবিশ্বাস্য দৈহিক বলের চিহ্ন।

রামচন্দ্রকে দেখেই তিনি ক্ষোভে ও রোষে যেন ফেটে পড়লেন। বললেন, 'সখা, এ তোমার কি ব্যবহার? আমি যে বালীর সম-যোদ্ধা নই, তা জেনেই তো এই দীর্ঘকাল নির্বাসিত জীবনযাপন করছি। তাতে দুঃখ ছিল, কষ্টও ছিল, কিন্তু অপমান বা লজ্জার কারণ ছিল না।

এ তুমি কি করলে ? আমার প্রজাবর্গের নিকট, কি অনুচরদের সম্মুখে মাথা তুলে দাঁড়াবার পর্যন্ত উপায় রাখলে না। তুমি কোন সাহায্যই করতে পারবে না জেনেও বৃথা আমাকে উত্তেজিত ও মিথ্যা আশান্বিত করলে কেন ?'

তখন রাম ও মহাবীর উভয়েই বিনয় বচনে তাঁকে প্রবোধ দান ক'রে সঙ্কটজনক পরিস্থিতিটা তাঁকে বুঝিয়ে বললেন।

এ ক্ষেত্রে যে ভ্রমের সম্ভাবনা ছিল, তা সুগ্রীবের পক্ষে প্রাণান্তক হতে পারত এবং সে ক্ষেত্রে রামচন্দ্রের পক্ষেও সকল আশার বিনষ্টি ঘটত।

এক্ষণে উপায় ? সুগ্রীব কিঞ্চিৎ সুস্থ হয়ে বিমূঢ়ভাবে প্রশ্ন করলেন।

উপায় রামচন্দ্রই বলে দিলেন।

কিছুদূরে বনতল আলোকিত ক'রে একটি পুষ্পভারশোভিতা নাগ-পুষ্পীলতা যেন বর্ণসমারোহ সৃষ্টি ক'রে রেখেছে।

রাম লক্ষ্মণকে বললেন, 'বৎস, তুমি ঐ লতা এনে একটি মাল্য রচনা করো এবং তা সুগ্রীবের কণ্ঠে বিলম্বিত ক'রে দাও। মাল্যধারী সুগ্রীবকে চিহ্নিত করতে আর অসুবিধা হবে না।'

লক্ষ্মণের আহরিত পুষ্পিত লতার মাল্য পরিধান ক'রে সুগ্রীব আশ্বস্ত ও আশান্বিত হলেন।

অতঃপর তাঁরা গোপনে পুনশ্চ কিষ্কিন্ধ্যার দুর্গের নিকটে এসে বনান্তরালে এক প্রস্রবণ-তীরে বিশ্রাম করতে লাগলেন।

স্থির রইল যে, পরদিন প্রভাতে পুনশ্চ দুর্গের সিংহদ্বারে গিয়ে সুগ্রীব সিংহনাদপূর্বক বালীকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করবেন।

॥ নয় ॥

এ সমস্ত মন্ত্রণা ও জল্পনা, যুদ্ধের বিবরণ অর্থাৎ সুগ্রীবের শোচনীয় পরাজয় এবং উভয়কে বিচ্ছিন্নভাবে চিহ্নিত করার কৌশল অবলম্বন—কিছুই তারার অবিদিত ছিল না।

তাঁর গুপ্তচররা, বিশেষ বালিকা বিদিশা প্রভাতকাল থেকেই ক্ষণে ক্ষণে সকল সংবাদ তাঁকে পৌঁছে দিচ্ছিল।

পরাজয়ের সংবাদে তারা অতটা বিচলিত হন নি, কারণ তিনি জানতেন—অনুমান করেছিলেন, কোথাও একটা কিছু ভুল হয়ে গেছে। সে ভুল অচিরে সংশোধিত হবে। এখন এই নাগপুষ্পীলতার মাল্য রচনার কথা শুনে তাঁর অনিন্দ্য ললাটে দুশ্চিন্তা ও অসন্তোষের ভ্রূকুটি ঘনীভূত হ'ল।

ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ তাচ্ছিল্য এবং অনুকম্পা মিশ্রিত বিদ্রূপের হাসিও দেখা দিল।

এই বুদ্ধি নিয়ে এরা যুদ্ধ করে! রাজ্য রক্ষা ও রাজ্য অধিকার কামনা করে!

প্রাত্যহিক জীবনের সামান্য তুচ্ছ তথ্যও লক্ষ্য করে না।

অহরহ চতুর্দিকে যা ঘটছে, সে সম্বন্ধেও এরা উদাসীন।

আশ্চর্য!

পুরুষের দৈহিক বল ছাড়া আর কোন যোগ্যতা নেই। বুদ্ধিতে, মানবচরিত্র-পঠনে ও নিয়ন্ত্রণে স্ত্রীলোকের অনেক বেশী যোগ্যতা।

কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে তিনি বিদিশাকে সঙ্গে নিয়ে নিজের কক্ষে গেলেন। কতকগুলি বিচিত্র বর্ণের পরিধেয় বস্ত্র শয্যার উপর রেখে, তীক্ষ্ণধার প্রস্তরাস্ত্রে তা খণ্ড-বিখণ্ড করলেন। তারপর সেগুলি প্রস্তর-পাত্রে রক্ষিত এক প্রকার বৃক্ষরসের সাহায্যে—যা ওঁর প্রসাধনে প্রয়োজন হয়, কোন রূপসজ্জা দেহের বা বস্ত্রের সঙ্গে লিপ্ত রাখার জন্য—সেই বল্কল-সঞ্জাত বস্ত্র দিয়ে পুষ্প রচনা করলেন এবং সেগুলি একসঙ্গে গ্রথিত ক'রে মাল্যে পরিণত করলেন।

না, নাগপুষ্পীর মতো নয়—আরও উজ্জ্বল বর্ণের।

দুরূহ কার্য, সময়সাপেক্ষ।

নিপুণতার অভাব নেই, তবে তা আছে বলেই—সূক্ষ্ম শিল্প রচনায়

পারদর্শিনী বলেই—তারা জানেন, এসব কার্যে দ্রুত হস্তচালনা অনভিপ্রেত।

সন্ধ্যা ঘনীভূত হ'ল। ক্রমে রাত্রিও এল। সে রাত্রিও গভীরতর হ'ল। এক সময় প্রথম প্রহরের যামঘোষ রবও উঠল চতুর্দিকের বনস্থলী থেকে। প্রাসাদের বিবিধ জীবনচাঞ্চল্যও নীরব হয়ে এল। শুধুই মধ্যে মধ্যে বন্য জন্তুর গর্জন ব্যতীত সমস্ত জগৎসংসারে যেন এক অখণ্ড নীরবতা নেমে এল।

মাল্য রচনা অবশেষে একসময় সমাপ্ত হ'ল। ক্লান্ত বিদিশাকে নিজের অঙ্কে তুলে নিয়ে স্নেহচুম্বনে তাকে আদর ক'রে অনুনয়ের ভঙ্গীতে বললেন, 'মা, তুই অনেক কষ্ট করেছিস সারাদিন, খুবই পরিশ্রান্ত বুঝতে পারছি। তবু তোকে মিনতি করছি, আর একটু কষ্ট কর। যা হোক অল্প কিছু আহার ক'রে নে, সুপক্ক বহু ফল এখানেই আছে, তারপর গোপন পথে, সম্ভব হলে অভ্যস্ত পথ ছেড়ে, বৃক্ষে উঠে শাখা থেকে শাখান্তরে যাবার চেষ্টা করে তুই একবার সুগ্রীবের কাছে যা। আমার নাম ক'রে বলবি, ঐ পুষ্পমাল্য ত্যাগ ক'রে এই বস্ত্র-প্রস্তুত মাল্য পরিধান ক'রে যেন কাল বালীর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। নাগপুষ্পীলতা যতই ঘাতসহ হোক, তুই মহাবলীর দেহঘর্ষণে, বিশেষ হস্ত চালনায়, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য। যদি যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া মাত্র রামচন্দ্র বালীকে বধ করতে না পারেন তাহলে পুনরায় সেই একই সমস্যা দেখা দেবে। আর সুগ্রীবের প্রাণসংশয় হওয়াও আশ্চর্য নয়। কারণ মাল্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন স্খলিত হলেই কে কোন্ জন তা বোঝা কঠিন হবে।'

বিদিশা যখন এই বার্তাসহ বস্ত্রমাল্য সুগ্রীবের হস্তে অর্পণ করল, তখন কৃতজ্ঞতা, প্রেম, দ্বিগুণিত কামনা প্রভৃতি বিভিন্ন মনোভাবের সমন্বয়ে সুগ্রীবের দুই চক্ষু সেই ঘোর নিশীথের তিমিরান্ধকারেও শ্বাপদের চক্ষুর মতোই জ্বলে উঠল।

কামনাই সমধিক। এ নারীকে তাঁর নিজস্ব ক'রে পেতেই হবে।

তার জন্য সুদ্ধমাত্র অগ্রজ কেন, সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলেও তিনি করবেন।

বিদিশাকে পাঠালেন তারা বালীবধ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই। তার প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত উৎকণ্ঠিতভাবে অন্ধকার বহিরলিন্দে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন, কিন্তু বিদিশা ফিরে এসে সুগ্রীবের কৃতজ্ঞতা ও আজ্ঞানুবর্তিতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ক'রে বিশ্রাম করতে যাওয়ার পরও বহুক্ষণ পর্যন্ত তাঁর শ্রান্ত দুই চোখে নিদ্রার আভাস মাত্র দেখা দিল না।

কিন্তু, এতকাল—দুশ্চিন্তা, অস্থিরতা, এঁদের সংবাদের জন্য আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা প্রভৃতির যে কারণ ছিল—নিশ্চিন্ত না হতে পারার ; যে কারণে এতকাল বিশ্রাম বা নিদ্রায় সুখ কি শান্তি ছিল না, বরং নিরন্তর অনবসরেই দিন কেটেছে—অদ্যকার এ অস্থিরতার কারণ তা নয়!

বরং বিপরীত।

বালীর মৃত্যুকে প্রায় নিশ্চিত করার পর থেকেই কোথায় একটা বিবেকের দংশন অনুভব করছেন মনে মনে।

ওঁদের কাছে অপরিচিত ও অবিশ্বাস্যরূপ বিস্ময়কর—রামচন্দ্রের অস্ত্রগুলির যে বিবরণ উনি শুনেছেন—শূন্যগর্ভ বংশনলের সাহায্যে দূর থেকে নিজের চোখেও দেখেছেন কিছু কিছু—তাতে বালীর মৃত্যু যে অবধারিত, সে সম্বন্ধে আর সংশয়ের অবকাশ নেই।

এখন—কোন এক বিচিত্র কারণে ভিন্নমুখী এই প্রশ্ন জাগছে মনে—তিনি কেন সেই মৃত্যুকে নিশ্চিততর ক'রে তুলতে গেলেন, ওঁদের বৈর-হুতাশনে এই সহজদাহ্য সমিধ নিক্ষেপ করলেন?

হ্যাঁ, বালী ওঁকে উপেক্ষা করেছেন। সম্ভবতঃ ওঁর অস্তিত্বই ভুলে গেছেন এতদিনে এটা সত্য ; তবে সে আচরণকে উনি বিশ্বাসঘাতকতা বলতে পারেন না কোনমতেই।

ওঁদের সমাজে আর্যদের মতো বিবাহপ্রথা নেই। অগ্নি সাক্ষী ক'রে শপথও করতে হয় না। তত্রাচ, সে সমাজেও বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত

আছে। নৃপতিরা, ধনী ব্যক্তিরা বহু নারী সম্ভোগ করেন এবং নবীনা বধূ আসার পরও পুরাতন সম্বন্ধে পূর্ববৎ আগ্রহ বা আসক্তি থাকে, এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। তা থাকা সম্ভবও নয়।

বালী ওঁর সন্তানের পিতা। বালীর অবর্তমানে ওঁর পুত্রেরই এ রাজ্য শাসন করার কথা। বালী ওঁকে অবহেলা করা ছাড়া বা ওঁর সম্বন্ধে নিস্পৃহ হওয়া ছাড়া আর কোন অপরাধ করেন নি। তাও কোন কোন দিন, কদাচিৎ কখনও যে তারাকে স্মরণ করেন না, তাও তো নয়।

তবে কেন এ কাজ তিনি করতে গেলেন?

সুগ্রীব তাঁকে যেভাবে পূজার মতো ক'রে ভালবাসে, বালী হয়ত সেভাবে বাসেন না, কিন্তু সে তো ব্যক্তিগত রুচি ও মানসিক গঠনের কথা। দানবের মতো যার দৈহিক শক্তি, তার ক্ষুধাও সেইমতো হবে। সেখানে রুচির প্রশ্নই ওঠে না। আর ওঁর প্রতি প্রবল আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও সুগ্রীবেরও তো বহু নারী সম্ভোগে আসক্তি কম নেই। অথবা, রুমা প্রধানা ও প্রথমা সঙ্গিনী হলেও তাতেই মন স্থির নেই।

এ-ই পুরুষ। সব পুরুষই এই। তবে তিনি এমন ও এত কাণ্ড করতে গেলেন কেন? নিরঙ্কুশ রাজ্যলাভের পরও সুগ্রীবের এই পূজা ও স্তুতি যে অব্যাহত থাকবে, তারই বা নিশ্চয়তা কি?······

এক্ষণে আর হস্তচ্যুত অক্ষ কি সম্বরণের কোন উপায় নেই?

কি করবেন, আর একটি মাল্য রচনা ক'রে বালীর কণ্ঠে লম্বিত করবেন?

কিন্তু বালী কি তা ধারণ করবেন?

আর সুগ্রীব এ আচরণকে নিশ্চিত প্রবঞ্চনা বলে মনে করবেন!

এবং এবার যদি ঐ আর্য যুবকটি বালীকে যথাসময়ে বধ করতে না পারে—বালীর হস্তে সুগ্রীবের মৃত্যু সুনিশ্চিত।

সে ক্ষেত্রে তারাই কি সুগ্রীবের হত্যাকারিণী হবেন না?

নিজের অবিমৃশ্যকারিতায় অনুতপ্ত তারা সুবর্ণ পালঙ্কের সুখশয্যায় শয়ন ক'রেও ত্রিযামা রজনী যে বিনিদ্র অতিবাহিত করেন তাই নয়,

নিজেই বার বার নিজের ললাটে করাঘাত ক'রে স্ত্রী-বুদ্ধিকে ধিক্কার দিতে থাকেন।

তখনও পর্বতের অত্যুচ্চ শৃঙ্গ থেকে উষার প্রথম আলোকাভাস বন-স্থলীর বৃক্ষাগ্রভাগকে স্পষ্ট ক'রে তোলে নি—তখনও পক্ষীকুল নিশিশেষ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ নয়, সেই কারণে তাদের অধিকাংশেরই কলকণ্ঠ নীরব—কিষ্কিন্ধ্যার প্রাসাদ-দ্বারে প্রচণ্ড গর্জন উঠল।

সুগ্রীবের বিকট হুঙ্কার ও আস্ফালন।

আবার সুগ্রীব!

নিজের শ্রুতিশক্তিকেও বিশ্বাস করতে বিলম্ব হ'ল বালীর।

এ স্বপ্ন অথবা বাস্তব—নিরূপণ করতে, শেষ রাত্রির গাঢ় নিদ্রার বিহ্বলতা কাটতেও কিছু সময় লাগল।

সময় লাগল শয্যাসঙ্গিনীর প্রগাঢ় আলিঙ্গন শিথিল ক'রে উঠে বসে অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করতে।

তবে বেশীক্ষণ সন্দেহ থাকার অবসর রইল না।

কারণ সুগ্রীবের তর্জনগর্জন ক্রমেই উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে পৌঁচচ্ছে। এ কণ্ঠস্বর ভুল হবার কোন কারণ নেই।

বিস্ময়ের সীমা রইল না বালীর।

সুগ্রীব এত নির্লজ্জ হবে, এত অকৃতজ্ঞ!

আজ এই কয়েক প্রহর পূর্বেই তাকে যেভাবে বিমর্দিত বিমথিত ক'রে কেবলমাত্র প্রাণটুকু অবশিষ্ট থাকতে তাকে অব্যাহতি দিয়েছেন—বরং বলা উচিত পলায়ন করার সুযোগ দিয়েছেন—তাকে এক রকম প্রাণদান করাই বলে।

তৎসত্ত্বেও মাত্র এই কয়েক প্রহর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই, কোন্ লজ্জায়, কোন্ ধৃষ্টতায় সে আবার এসে এই মূঢ়গর্ভ স্পর্ধা প্রকাশ করছে?

বিস্মিত হলেন কিন্তু এর কারণ অনুসন্ধানে কালক্ষেপ করলেন না।

বুদ্ধির শরণাপন্ন হয়ে, যুক্তিপ্রয়োগ ক'রে, তথ্য বা সংবাদ সংগ্রহ ক'রে, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা ক'রে কোন কার্যে প্রবৃত্ত হওয়ার মতো ধৈর্য কোনদিনই বালীর ছিল না।

ক্রোধ এবং অসহিষ্ণুতাই ওঁর স্বভাবের মধ্যে প্রধান।

উগ্র, বিকট ক্রোধ। হিতাহিতজ্ঞানশূন্য, ক্রুদ্ধ ব্যবহার—ক্রোধতরুমূলে অবিরাম অতিরিক্ত আত্মবল-বিশ্বাসের বারি নিষেক, শক্তির অহঙ্কার-মত্ততা। এ-ই তাঁর স্বভাবধর্ম।

ঘটনাটা কি ঘটছে, সে সম্বন্ধে সচেতনতা আসা মাত্র আর বিন্দুমাত্র বিলম্ব তাঁর সহ্য হ'ল না। যে নারী পুনশ্চ তাঁর কণ্ঠলগ্ন হয়েছিল, নিশিশেষের উপভুক্ত মাল্যের মতো তার বাহুবন্ধন ছিন্ন ক'রে তাকে দূরে নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর শয্যাত্যাগ ক'রে পরিধেয় বস্ত্রেই কটিবন্ধন দৃঢ়সম্বদ্ধ করতে করতে অবিলম্বে বহির্গমনের উদ্যোগ করলেন।

অন্যান্য নারীরা কোলাহল ক'রে উঠলেন। কেউ কেউ সতর্ক করারও প্রয়াস পেলেন। বাহিরে সদ্যনিদ্রোত্থিত আতঙ্কগ্রস্ত কর্মচারী বা মন্ত্রীর দল শুষ্কমুখে তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। কিন্তু সে শুভ ও কল্যাণকর প্রচেষ্টার কি পরিণাম হবে, তা জানা থাকায় শুষ্কমুখেই ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। তাঁদের কণ্ঠ ভেদ ক'রে কোন শব্দ নির্গত হ'ল না।

প্রায় সকলেই সুগ্রীবের এই দুঃসাহসের নানারূপ হেতু অনুমান ক'রে কিছু আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছেন। কিন্তু সে সংশয় ও হিতবাক্য তো বালীকে বলা সম্ভব নয়।

ঠিক সেই সময়ে দীর্ঘকাল পরে কক্ষদ্বার-পথে পথরোধ ক'রে এসে দাঁড়ালেন তারাদেবী।

এবার অনেকেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। ক্রুদ্ধ সিংহের উপযুক্ত দুঃসাহসিকা সিংহিনী—কেউ পারে তো ইনিই পারবেন বালীর শূন্য মস্তিষ্কে শুভবুদ্ধি সঞ্চারিত করতে।

তারা বালীর হস্তে হস্ত রক্ষা ক'রে যেন তাঁকে নিরস্ত করার ভঙ্গীতে অশ্রুকম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'মহারাজ, অশোভন অহিতকর বিচারশূন্য ক্রোধ সম্বরণ করুন। বারেক স্থির হয়ে বিবেচনা করুন, একটু যুক্তি প্রয়োগ ক'রে চিন্তা করুন—কল্যকার শোচনীয় লজ্জাজনক পরাজয়ের অনতিকালমধ্যে সে পুনর্বার স্পর্ধা প্রকাশ করার দুঃসাহস কোথা থেকে লাভ করে? নিশ্চয়ই কোন গুপ্ত সাহায্যের ভরসা রাখে। কুমার অঙ্গদের অনুচরেরা সংবাদ সংগ্রহ করেছে—উত্তরাখণ্ডস্থ কোশল দেশের দুই রাজকুমার সম্ভবতঃ রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে এইদিকে এসেছেন এবং সম্প্রতি এই অঞ্চলেই প্রবেশ করেছেন। আরও সংবাদ পাওয়া গেছে, গত দুই তিন দিবস তাঁরা ঋষ্যমূক সংলগ্ন বনস্থলীতে বাস করছেন। তাঁদের সঙ্গে বহু প্রকার সাংঘাতিক অস্ত্র আছে, যা এ দেশের কোন ব্যক্তি অদ্যাপি দেখে নি। তার ব্যবহারও জানে না। তবে তাঁদের আশ্চর্য শক্তি একজন প্রত্যক্ষ করেছে। দূর থেকেও শর নামক এক শাণিত অস্ত্র নিক্ষেপ করে ওঁদের এক রাজকুমার সাতটি তালবৃক্ষ ভেদ করেছেন। আমার মনে হয়, সুগ্রাব সেই ব্যক্তিদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেছেন। তাঁদেরই আশ্বাসে সাহস সঞ্চয় ক'রে এইরূপ নির্লজ্জতা প্রকাশে প্রবৃত্ত হয়েছেন। সম্ভবতঃ আপনি একক এই দুর্গ থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়া মাত্র সেই দুই নৃপতিতনয় তাঁদের অস্ত্রে আপনাকে অতর্কিতে বধ করবেন। ওঁরা বর্বর, দ্বৈরথ যুদ্ধের সুপ্রাচীন রীতি পালন করবে এমন আশা কম। অতএব আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, আপনি অন্তুতঃ এক দণ্ডকাল ধৈর্য অবলম্বন করুন। প্রভাত স্পষ্টতর হয়ে উঠুক, দুর্গচূড়া থেকে বাহিরের অবস্থা ও শত্রুর অবস্থান দেখে আপনি একেবারে সসৈন্যে নিষ্ক্রান্ত হোন। দু'জন মাত্র ব্যক্তি—তাঁদের যত অস্ত্রই থাক—এতগুলি বানর সৈন্যের আক্রমণ প্রতিরোধ ক'রে সুগ্রীবকে রক্ষা করতে পারবেন না।'

অসহিষ্ণু, দুর্বার ক্রোধী বালী এই সৎ পরামর্শে কর্ণপাত করলেন না, পরন্তু কিছু অশ্রাব্য কটূক্তি করে তারাকে সরিয়ে বলপূর্বক কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার চেষ্টা করতে গেলেন।

তবে তারাও নিতান্ত স্বল্প বলশালিনী নন। তিনি সে বেগ সংবরণ ক'রেও অনড় রইলেন। এবার যেন আরও করুণ বচনে বললেন, 'প্রভু, আমি আপনার ক্রোধ বর্ধিত করতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু আমার আরও কিছু বক্তব্য আছে, তা না শুনে আপনি এ গৃহ ত্যাগ করতে পারবেন না। আমার পরামর্শ, আপনি অবিলম্বে দূত প্রেরণপূর্বক সুগ্রীবের সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন করুন, এবং তাঁকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন। আপনি রাজকার্য কিছুই দেখেন না, তিান আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আপনার সন্তানতুল্য ও প্রতিপাল্য। তিনিই আপনার নিকটতম স্বজন, সুখে দুঃখে নিত্যসঙ্গী, সহজ বন্ধু। আপনি অকারণ বৈরিতা দূর ক'রে তাঁকে আপন ক'রে নিন, তাতে অগৌরবের কারণ নেই। বরং এ উদারতায় আপনার গৌরব বৃদ্ধি পাবে, সুবুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হবে। ভ্রাতৃসৌহার্দ্যের তুল্য বল নেই, তিনি যোগ্য অমাত্যগণসহ আপনার সেবা করলে কোন শত্রুই কিষ্কিন্ধ্যা আক্রমণ করতে সাহস করবে না। আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী, আমার অনুরোধ রাখুন, অবিলম্বে সুগ্রীবের প্রতি এই শত্রুভাব দূর করুন। নচেৎ ঐ দুই রাজকুমার সুগ্রীবের সাহায্যকারীরূপে এই বিরোধে অংশগ্রহণ করলে আপনি কিছুতেই নিরাপদ থাকতে পারবেন না। আপনি প্রসন্ন হোন, আমাব পরামর্শ গ্রহণ করুন।'

মৃত্যুরূপিণী নিয়তি যার মস্তিষ্কে প্রবেশ করে, সে যথার্থ হিতোপ-দেশে কর্ণপাত করবে কেন!

ক্রুদ্ধতর বালী এবার সবলে তারাকে দ্বারপ্রান্ত থেকে অপসাসিত ক'রে, লোহিত লোচনে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে ভৎ‍র্সনা করলেন, 'তুমি এতাবৎকাল আমার সঙ্গলাভ করলেও আমার প্রকৃতি অবগত হও নি। স্ত্রীলোক যতই বুদ্ধিমতী হোক, তাদের বুদ্ধি পৌরুষের সম্মানের কথা চিন্তা করতে পারে না। তোমরা স্বভাবতঃ ভীরু, সেই জন্যই প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, স্ত্রীমতি ও স্ত্রীবুদ্ধি সর্বদা বক্রপথে চলে। শত্রু দ্বার-প্রান্তে গর্জন ক'রে স্পর্ধা প্রকাশ করছে, এ সময় আমি নিজের নিরাপত্তা

চিন্তা ক'রে আত্মগোপন ক'রে থাকব! ধিক! তার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। আর ঐ দুই মনুষ্য যদি সত্যই রাজবংশীয় কি রাজপুত্র হন তাঁরাই বা আমায় বিনা দোষে, বিনা বিচারে বধ করবেন কেন? তুমি এই বৃথা ভয় পরিহার করো, আজ আর আমি কোন প্রকার দয়া মায়া রাখব না মনে, জ্ঞাতি-কণ্টকতরু সমূলে বিনষ্ট ক'রে অচিরে প্রত্যাবর্তন করব। তুমি কয়েক দণ্ড মাত্র ধৈর্য ধারণ করো।'

অতঃপর বালী কর্কশতর ও প্রচণ্ডতর হুঙ্কার ত্যাগ ক'রে অবিলম্বে দুর্গ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

॥ দশ ॥

তারাদেবী বালীর মৃত্যু চেয়েছিলেন, না চান নি?

ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি কি চিন্তা করছিলেন?

তা বোধ করি তিনিও জানেন না।

বিবেকের কাছে অপরাধ স্খালন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন তিনি। করেছেন যেন কতকটা অপর কারও চালনায়—যন্ত্রচালিতের মতো।

মনের মধ্যে ঐ কথাটা বোধ করি অকস্মাৎই মনে এল, সুগ্রীব যদি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হয়ে এ রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন, এ প্রাসাদের পূর্বনির্দিষ্ট অংশে অথবা সন্নিকটে কোথাও নূতন বাসভবন নির্মাণ করেন, তাহলে বালীর মৃত্যুতে তাঁর প্রয়োজন কি?

যদি এই কথাটা কিছুদিন পূর্বে তাঁর মনে আসত, সেইভাবে কর্মপন্থা বিস্তার করলে, পরিকল্পনা স্থির ক'রে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলে, এ কার্য বোধ করি একেবারে অসাধ্যও হ'ত না।

বালী ক্রোধী। ক্রোধী বলেই নির্বোধ।

ক্রোধে শুভবুদ্ধি লোপ পায়—এ কথা সর্বজনবিদিত।

হিতাহিত-জ্ঞান বা বিবেচনাও যেমন থাকে না, তেমনি অপরের যুক্তি খণ্ডন করার মতো শক্তিও না।

সতর্কভাবে অগ্রসর হলে তাঁকে নিজের মতে আনয়ন কবা একেবারে অসাধ্য হ'ত না।

কিন্তু তিনি মন্দভাগিনী। সে উপায়ের কথা পূর্বে চিন্তা করেন নি।

ক্রোধ শুধু নয় —অহঙ্কার ও মোহও বিমূঢ়তার কারণ হয়।

তারার বুদ্ধির অহঙ্কার বুঝি চিরদিন তাঁকে মন্দ পথেই চালনা করল। বালীই এক প্রকাব ওঁদের জাতির রীতি অনুযায়ী ওঁব ভর্তা, পতি। শেষে উনি কি পতি-ঘাতিনী বলে পরিচিত হবেন ?

হ্যাঁ, কিছু প্রায়শ্চিত্ত করলেন বটে, শেষ মুহূর্তে সৎ-পরামর্শ দিতে গিয়ে, চিরদিনের নির্বোধেব মনে শুভবুদ্ধি সঞ্চারিত করার প্রয়াস পেয়ে —কিন্তু তাই কি যথেষ্ট ?

বিহ্বলের মতো তারাদেবী প্রাসাদ-প্রাচীর-সংলগ্ন মুক্ত অলিন্দে গিয়ে দাঁড়ালেন, অশ্রুমুখী, ভীত, সন্ত্রস্ত পুরবাসিনীদের সঙ্গে। ওঁদের থেকে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে বহু প্রহরী, সেবক ও সৈনিকও ছিল। তাদের সকলেরই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা। বালীর বিনা অনুমতিতে দুর্গের বাহিরে যেতে সাহস হচ্ছে না, অথচ একটা বিবেকদংশনও অনুভব করছে—কর্তব্যের বুঝি একটা মার্জনাতীত ত্রুটি বা অবহেলা ঘটে গেল। বালী অপেক্ষা সুগ্রীবই তাদের অধিকাংশের সমধিক প্রিয়, তবু কর্তব্যানুরোধে তাদের বালীর সঙ্গী হওয়ার ইচ্ছা।

কিন্তু বালী নিজের স্বভাব-দোষেই সে সাহায্যটুকু থেকেও বঞ্চিত হলেন। অনায়াসে যেখানে বিপন্মুক্ত না হোক কিছুটা নিরাপদ হতে পারতেন—সেখানে অকারণে একা বিপদের সম্মুখীন হয়ে মৃত্যুকে যেন আমন্ত্রণ জানালেন।

যুদ্ধের পরিণতি তারা যা আশঙ্কা বা অনুমান করেছিলেন—তাই হ'ল।

পূর্ব দিনের পর্যাপ্ত প্রহার-জর্জরিত সুগ্রীব আজ এক দণ্ডকালও বালীর প্রচণ্ড-উষ্মাপ্রণোদিত আক্রমণ সহ্য করতে পারলেন না। তাঁর নাসিকা ও দেহের অন্যান্য স্থান থেকে প্রচুর রক্তপাত হতে লাগল; মুষ্ট্যাঘাতে তাঁর দেহের অস্থি পর্যন্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল; শেষ অবধি যখন বালী তাঁকে শূন্যে উত্থিত ক'রে সবেগে শিলাপট্টে নিক্ষেপ করতে উদ্যত হলেন—তখন প্রায়-মুমূর্ষু সুগ্রীব সকাতরে রামের গুপ্ত অবস্থানের দিকে ইঙ্গিতে সাহায্য প্রার্থনা করলেন।

বোধ করি তার প্রয়োজন ছিল না। অভিজ্ঞ রামচন্দ্র তাঁর অবস্থা অনুমান ক'রে, পূর্বেই নিজ কার্মুকে শর যোজনা করেছেন—এক্ষণে নক্ষত্রবেগে সেই সুতীক্ষ্ণ সুশাণিত শর এসে বালীর বক্ষে বিদ্ধ হ'ল।

রামচন্দ্র বৃক্ষান্তরালে থেকে এই মুহূর্তটিরই অপেক্ষা করছিলেন। সুগ্রীবকে অসহায় বা মৃত্যুর সম্মুখীন না দেখলে, তিনি বালীর প্রতি অস্ত্রত্যাগ করতে পারেন না। এ তাঁর বীরের ধর্মে বাধে।

বিরাট পর্বতশৃঙ্গের মতো বালীর বিশাল দেহ ভূমিতে পতিত হতে, শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে কিষ্কিন্ধ্যাবাসীরা হাহাকার ক'রে উঠলেন। বালী তাঁদের নিরাপদ আশ্রয়, সহায়। বালীর ঔদ্ধত্য যতই অসহ্য বোধ হোক—এটা সকলেই জানেন, বালী জীবিত থাকতে কোন বহিঃশত্রু তাঁদের দেশ আক্রমণ করতে সাহস করবে না।

বালী জীবনেও যেমন, মৃত্যুতেও তেমনি—তাঁর দেহই সন্ত্রাস- ও সম্ভ্রম-উদ্দীপক। দেহ বিশাল, বক্ষ প্রশস্ত, বাহু আজানুলম্বিত। হরিদ্রা-ধূসর বর্ণ। তাঁর দৈহিক গঠনের জন্যই তিনি সকলের ভীতির পাত্র ছিলেন।

তৎসত্ত্বেও বালী সুদর্শন ছিলেন, পৌরুষশ্রীমণ্ডিত তাঁর মুখ এ দেশের হিসাবে সুন্দরই বলা চলত। এখন সেই আশ্চর্য সুন্দর দেহ যেন নূতন রূপে সকলের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হ'ল। রত্নখচিত কণ্ঠী ও সুবর্ণখচিত রামের অস্ত্রসহ তাঁর রক্তাক্ত দেহ সুবর্ণবেদীমণ্ডিত পুষ্পিত অশোকের সৌন্দর্য ধারণ করল।

বালীর পতনের পর, ঈষৎ অপ্রতিভ রামচন্দ্র তাঁর নিকটে এসে দাঁড়ালেন। বালী প্রচুর রক্তক্ষরণে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন ইতিমধ্যেই, তত্রাচ তিক্ত কঠোর কণ্ঠে রামকে তিরস্কার করলেন—

'রাম, আমি অপরের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলাম, তোমার কোন অনিষ্ট করি নি, তথাপি বৃক্ষান্তরাল থেকে গুপ্তঘাতকের মতো আমাকে হত্যা ক'রে তোমার কি লাভ হ'ল? শুনেছি, তুমি সদ্বংশীয়। তোমার পূর্ব-পুরুষরা ধার্মিক ও প্রজাপুঞ্জের পালনকারী বলে বিখ্যাত, তুমিও কোন সৎ-কারণে ব্রহ্মচর্য ব্রত নিয়ে অরণ্যবাসী হয়েছ—এই কি তোমাদের ধর্মবুদ্ধি ও ব্রত পালন? তারা আমাকে তোমার সম্বন্ধে সতর্ক করতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি তাতে কর্ণপাত করি নি, তোমার শূরধর্মের উপরই আস্থা স্থাপন করেছিলাম। ভেবেছিলাম, আমার সঙ্গে যখন তোমার কোন প্রকার বিরোধ নেই—তুমি কেন আমাকে বধ করবে?

'রাম, এখন বুঝছি, তুমি অতি দুরাত্মা, ধর্মধ্বজী অধার্মিক! তুমি তৃণাবৃত কূপ ও ভস্মাবৃত বহ্নির মতোই। তুমি ধর্মের আচরণে অধর্মাচরণ করো। তুমি দুরাত্মা, পাপিষ্ঠ। ধর্মকপটী সাধুর বেশ ধারণ করেছ, অধর্মাচরণের সুযোগ পাবে বলে। ছ্যাখ, ভূমি, স্বর্ণ প্রভৃতি লোভনীয় বস্তুর জন্যই লোকে নরহত্যা করে, আমাকে বধ ক'রে তোমার কি ইষ্টসিদ্ধি হ'ল? আমার চর্ম লোম মাংস অস্থি তোমার কোন কাজেই লাগবে না। মৃগ ব্যতীত শশ, গোধা প্রভৃতি পঞ্চ প্রকার মাংস আর্যরা ভক্ষণ করে থাকেন বলে শুনেছি; আমাদের মাংস খাদ্য নয়। তবে? যে সকল পাপী মৃত্যুর পর নরকস্থ হয়—রাজহন্তা তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। আমি অরণ্যচর হলেও, এক সম্প্রদায়ের রাজা—তুমি কুটিল সর্পের মতো অন্যের অগোচরে এসে আমাকে বধ করলে—এ পাপ তোমার সহজে স্খালন হবে না।'

এই পর্যন্ত বলে রক্তক্ষরণজনিত শ্রান্তি ও সহ্যাতীত উত্তেজনায় কিয়ৎকাল নীরব থেকে পুনশ্চ বললেন—

'আমি চরমুখে সংবাদ পেয়েছি, তোমার ভার্যা অপহৃত হয়েছেন,

সেই কারণেই তুমি উন্মাদবৎ আচরণ করছ। উন্মাদরাও পাপাচরণ করলে অব্যাহতি পায় না। তত্বপরি, স্ত্রীর সন্ধানের জন্য তুমি সুগ্রীবের সঙ্গে সখ্য স্থাপন ক'রে আমাকে এভাবে গুপ্তঘাতকের মতো বধ ক'রে অন্যায় শুধু নয়, একান্ত অজ্ঞান নির্বোধের মতো আচরণ করেছ। তুমি আমার সাহায্য প্রার্থনা করলে, আমি অচিরে তোমার নারীকে এনে দিতাম। তার অপহরণকারী যে-ই হোক বা যেখানেই থাক, তাকে বন্ধন ক'রে তোমার কাছে এনে দিতাম, স্বর্গ-মর্ত-পাতাল বা সমুদ্রগর্ভে আত্মগোপন করলেও, আমার হস্তে অব্যাহতি পেত না, তোমার স্ত্রীকেও বন্দিনী রাখতে পারত না। তার জন্য তোমাকে কোন যুদ্ধ, কি কোন কষ্ট স্বীকার করতে হ'ত না। এ তুমি কি করলে? মৃত্যু জীব মাত্রেরই চরম পরিণাম, মৃত্যুর জন্য কোন দুঃখ নেই, বীরের ধর্ম পালন করতে করতে মরেছি, প্রতিদ্বন্দ্বী নিজে পরাজিত হয়ে, অপরের দ্বারা অতর্কিতে বধ করিয়েছে, এ তো গৌরবের মৃত্যু। কিন্তু বীরসন্তান শস্ত্রধারী কেউ গোপনে নরহত্যা করবেন কেন? আমাকে যুদ্ধে আহ্বান করলেও আমি অবশ্যই তোমার হস্তে নিহত হতাম। কারণ, তোমার যে সব ভয়াবহ, কৃতান্তসদৃশ অস্ত্র আছে—আমাদের তা একেবারেই অপরিজ্ঞাত। আমাদের সম্বল শুধুমাত্র দেহবল, অস্ত্র বলতে বৃক্ষ ও প্রস্তর। আমাকে যদি বধই করবে—মিথ্যা সুগ্রীবকেই বা এ পাপপথে আনলে কেন, ধর্মযুদ্ধেই নিহত করতে পারতে, এমন তস্কর-বৃত্তির তো কোন প্রয়োজন ছিল না?'

এই কঠোর ও মর্মঘাতী তিরস্কারে রামচন্দ্রও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবেন বৈকি!

তিনিও কঠিন কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'তোমাকে প্রচ্ছন্ন থেকে বধ করায় আমি কোন লজ্জার কারণ দেখি না। যারা কেবলমাত্র হস্ত পদ দিয়ে যুদ্ধ করে, তারা পশুরই সমান। নিরীহ মৃগকে বধ করার জন্য লোকে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য থেকে শর, বাগুরা বা পাশ প্রভৃতির সহযোগে যে কোন কূট উপায় অবলম্বন করে থাকে। সে জন্য কোন ব্যক্তিই লজ্জা

বোধ করে না। মৃগ বিশ্বাস করে শিকারীর নিকটে আসুক বা ভয়ে পলায়নপর হোক; নিজেদের মধ্যে বিবাদপর হোক বা অসতর্ক থাক, মাংসাশী মানুষ তাকে বধ ক'রে অনুমাত্র দোষী বলে গণ্য হয় না। আরও স্মরণ করো, তুমি আমাকে উচ্চবংশীয় রাজপুত্র, ধর্মের রক্ষক বলে স্বীকার করেছ। আমিও নিজেকে ধর্মের সেবক বলে মনে করি। কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুত্রতুল্য, তার নারীকে বলপূর্বক হরণ ক'রে সম্ভোগ করছ। সে তোমার পুত্রবধূতুল্যা নারী। এই কি যথেষ্ট পাপাচার নয়? সে ঘৃণ্য পাপীর সঙ্গে যুদ্ধ করব কেন? পরন্তু সেই অন্যায়ের প্রতিকারপ্রার্থীর হয়ে তাকে বধ করব—এ-ই ন্যায়সঙ্গত ও সমীচীন।'

বালী ততক্ষণে নিস্তেজ হয়ে পড়েছেন। তিনি আর বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হলেন না, করুণ কণ্ঠে বললেন, 'আমার একটি মাত্র পুত্র আছে—অঙ্গদ। সে আমার বড়ই স্নেহের পাত্র, সে এখনও নিতান্ত অবোধ। আমি চলে গেলে কে তাকে দেখবে, কেই বা তাকে রক্ষণাবেক্ষণ ভরণ-পোষণ করবে! তার গর্ভধারিণী তারা বড় তেজস্বিনী ও অভিমানিনী, আমার উপর জাতক্রোধ সুগ্রীব ওদের পীড়ন ক'রে হয়ত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে চাইবে! ওদের জন্যই এই অন্তিম মুহূর্তে বড় চিন্তা হচ্ছে।'

রাম এবার কিছু কোমল কণ্ঠে বললেন, 'মহাবলী, আমি তোমাকে অনায়াসে এ আশ্বাস দিতে পারি যে, সুগ্রীব তোমার পালক পুত্রকে স্বীয় পুত্রবৎ লালনপালন করবেন এবং মনস্বিনী তারাকেও তাঁর প্রাপ্য সম্মানের সঙ্গেই রক্ষা করবেন। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঈশ্বর চিন্তা করতে করতে স্বর্গে গমন করো।'

বালীর পতনের পরই তারাদেবীর এতক্ষণের স্তম্ভিত বিহ্বল ভাব নিমেষে দূর হয়ে গেল। তিনি শোকে আকুল হয়ে তখনই, বিস্রস্ত বসনে মুক্তবেণী অবস্থায় দুর্গ থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে চেষ্টিত হলেন।

কিন্তু ওখানকার রক্ষী সৈন্যের দল, পুরবাসী এবং পুরবাসিনীর দল সকলে তাঁর পথরোধ করে দাঁড়াল।

ওরা ইতিপূর্বে এমন ভয়াবহ সর্বনাশা অস্ত্র দেখে নি। যে অস্ত্র অনায়াসে বালীর মাতঙ্গবৎ-সুবিপুল-দেহ বীরকেও অনায়াসে এমন পলক-পাত কালে নিহত করতে পারে—তা ওদের কাছে সাক্ষাৎ কৃতান্ত বলেই বোধ হ'ল। ওরা যুদ্ধ ও অস্ত্র বলতে বাহু ও পদদ্বয়ের প্রহার, প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ বা বিশাল তরু উৎপাটিত ক'রে সমূহ শত্রুবিনাশ বোঝে। কিন্তু এ কি অস্ত্র! এই কি তাহলে ইন্দ্রের অশনি!

ওরা প্রাণভয়ে স্বেদার্দ্র ও বিবর্ণ হয়ে উঠেছে, বসন্ত পবনে হিল্লোলিত বেতস পত্রের মতোই কম্পমান। ওদের মধ্যে কিছু কিছু আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে ইতিমধ্যেই প্রাসাদের প্রত্যন্ত কোণের কোন অন্ধকার স্থানে আত্মগোপনের জন্য পলায়নপর হয়েছে।

যূথপতি নিহত হলে মৃগরা যেমন যূথভ্রষ্ট হয়ে প্রাণাশঙ্কায় ইতস্ততঃ লম্ফ দিতে ও কোন দিকে লক্ষ্য না ক'রেই পলায়নের চেষ্টা করে—কোন্ দিক কোন্ পথ নিরাপদ আর কোন্‌টা নয় —তা বুঝতে পারে না —এদেরও সেই দশা। ওদের তখন মনে হচ্ছে, রামের শর বিদ্যুৎ-গতিতে ওদের পিছনে পিছনে আসছে, আর রক্ষা নাই।

রোরুদ্যমানা তারা ভগ্ন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে অনুযোগ করলেন, 'বানর সৈন্যগণ, তোমরা চিরদিনই সর্বদা মহারাজ বালীর অনুগমন করো, তাঁর আদেশ পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ক'রে থাকো, আজ তাঁর চরম দুর্দিনে তাঁর থেকে দূরে পলায়ন বা আত্মগোপনের চেষ্টা করছ কেন? ক্রূর সুগ্রীব বালীকে অপসারিত করার জন্য রামের সঙ্গে পাপ-চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন, রাম তাঁর কর্তব্য সমাপন করেছেন। তোমাদের সঙ্গে তাঁর তো কোন বৈরিতা নেই, তিনি তোমাদের আক্রমণেরও চেষ্টা করেন নি, তবে তোমরা ঈদৃশ বিহ্বল হচ্ছ কেন? এক্ষণে সে রাজদেহ শিবা, শ্বান বা বায়সের ভক্ষ্য না হয়, তা দেখা কি তোমাদের প্রধান কর্তব্য নয়?'

প্রাণভয়ে উন্মত্তবৎ বানররা করুণ কণ্ঠে বললেন, 'জীবিতপুত্রে, তুমি এখন কদাচ দুর্গ থেকে নির্গত হওয়ার চেষ্টা ক'রো না। কৃতান্ত স্বয়ং রামের মূর্তি ধারণ ক'রে বালীকে নিয়ে যাচ্ছেন; রামের শর ইন্দ্রের বজ্র

অপেক্ষাও শক্তিশালী। ওদের সম্মুখীন হলে, আমাদের আর রক্ষা নাই। তোমার উচিত এখানেই এবং এক্ষণেই অঙ্গদকে রাজপদে অভিষিক্ত ক'রে সর্ব-প্রযত্নে তাঁর সিংহাসন রক্ষা করা। আমরা দ্বার অর্গলমুক্ত করলেই হনুমান নল নীল প্রভৃতি বীরগণ এখানে প্রবেশ করবেন। তাঁদের স্ত্রী পুত্র এখানে—তাঁরা ওদের রক্ষা অপেক্ষা এতদিনের নির্বাসন দুঃখের প্রতিশোধ গ্রহণেই তৎপর হবেন। তখন তোমাকে বন্দিনী ক'রে, অঙ্গদকে বধ করার চেষ্টাও অসম্ভব নয়।'

তারা এবার যৎপরোনাস্তি বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। বললেন, 'ইন্দ্রসদৃশ বালীর প্রতাপে সকলেই আমাকে সম্মান করত, ভয় করত। এক্ষণে আমি—সেই পুরুষ-সিংহের সিংহিনী—প্রাণভয়ে বৃক্ষকোটরে কি ভূমিগর্ভে আত্মগোপন করব! যদি বিশ্বত্রাস বালীই না থাকেন, আমার পুত্রেই বা কি প্রয়োজন? নিজের জীবন রক্ষা করার জন্যই বা ব্যস্ত হবো কেন? যিনি বালীকে বধ করেছেন, এক্ষণে তিনি যদি আমাকেও বধ করেন তো আমি তাঁর মঙ্গল কামনা করতে করতেই মরব। আমাকে ছেড়ে দাও, তোমাদের প্রাণের মায়া অধিক হয়ে থাকে—তোমরা তা রক্ষা করো, আমার স্থান আমার জীবিতেশ্বরের পদপ্রান্তে।'

তাঁর এইরূপে একাধারে ক্রুদ্ধ ও শোকার্ত মূর্তি দেখে আর কোন ব্যক্তিই তাঁকে বাধা দিতে বা নূতন কোন বিরুদ্ধ যুক্তি প্রয়োগ করতে সাহস করল না।

অবনত মস্তিষ্কে মৃত্যুভয়কম্পিত কলেবরে বৃহৎ দুর্গদ্বার অর্গলমুক্ত করে দিল। এবং তারা প্রায় উন্মাদিনীর মতো বালীর মৃতদেহের পার্শ্বে ছুটে যাচ্ছেন দেখে রক্ষীদের কিছু অংশ তাঁর অনুগমনও করল।

॥ একাদশ ॥

আত্মজিজ্ঞাসা বা আত্মবিশ্লেষণ তারাদেবীর চরিত্রের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

তিনি নিজেও এর জন্য কম বিস্মিত নন! এমন আর তিনি কারও দেখেন নি, তাঁর পূর্বেও আর কারও চরিত্রে এই গুণ বা দোষ আছে বলে তিনি জানেন না। সকলেই, নিজের আচরণ গর্হিত হলেও, বিবিধ যুক্তি প্রয়োগে নিজের বিবেকের কাছে তা সমর্থনের চেষ্টা করেন।

তারা সে মল্লভূমি-ক্ষেত্রে গিয়ে বালীর সাংঘাতিক আহত অচেতন দেহের উপর পড়ে হাহাকার শব্দে রোদন ক'রে উঠলেন। কিন্তু তার মধ্যেই তাঁর যেন এক পৃথক সত্তা তাঁকে সবিদ্রূপ কণ্ঠে প্রশ্ন করতে লাগল—'তোমার আচরণের কোন্‌টা সত্য—সুগ্রীবের নৈকট্য লাভের আশায় বালীকে অপসারিত করার ষড়যন্ত্র—না এখনকার এই শোক?'

এ প্রশ্ন অবশ্য চকিতের জন্যই মনে দেখা দিল, কারণ এ নিয়ে বিচার কি আলোচনা করার অবসর তখন নেই, পরন্তু প্রশ্নটা অবচেতনে দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর বিবেক যেন সেটা দু'হাতে ঠেলে সরিয়ে দিল। তবু এক সময় এক লহমার মতো আর একটা অনুভূতিও যেন অনুভব করলেন—আত্মগ্লানি অনুতাপে জর্জরিত সুগ্রীব ঐ যে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে আছেন—ওঁর জন্যও একটা গভীর মমতা বোধ করছেন তিনি।

না। এটা ঠিক উনি চান নি—এই পরিস্থিতি। সুগ্রীবের সান্নিধ্য ও সাহচর্য পেলেই তিনি সুখী হতেন। বালীকে বধ ক'রে—? না না, ঠিক তা নয়। তেমন কোন কর্মে তিনি যদি সহায়তা ক'রে থাকেন, সে নিতান্তই আবেগের বশে, ভবিষ্যৎ চিন্তা না ক'রেই।

এখন যদি সুগ্রীব রাজা হন, রুমাই রাজ-অন্তঃপুরের প্রধানা হবেন। তারাকে হয়ত তাঁর সহচরীদের অন্যতমা বলে গণ্য করা হবে। কে জানে

এখন এই প্রত্যক্ষ ভবিষ্যতের সম্মুখে দাঁড়িয়েই শোকটা এত প্রবল ও অসহনীয় বোধ হচ্ছে কিনা !……

তারা মৃতপ্রায় বালীকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন ক'রে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে লাগলেন। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বিলাপ করতে করতে বললেন, 'বীরশ্রেষ্ঠ, তুমি কেন আমার সঙ্গে আজ কথা কইছ না ? তুমি পুরুষ-সিংহ, তোমাকে সামান্য শৃগালপ্রবৃত্তি-অনুসরণকারী ব্যাঘ্র নিহত করল। তুমি কেন উঠে তার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিচ্ছ না ? আমার আলিঙ্গন অপেক্ষা আজ কি তোমার নিকট মৃত্তিকার স্পর্শ সুখদ বোধ হ'ল ? ওঠো, মিনতি করছি এ ভূমিশয্যা ত্যাগ ক'রে উৎকৃষ্ট পর্যঙ্কে সুকোমল শয্যায় গিয়ে শয়ন করো। হায়, কেন তুমি আমার আহ্বানে কর্ণপাত করছ না ? তোমার বীর্যে মুগ্ধ দেবতাগণ কি তোমার জন্য কিষ্কিন্ধ্যা অপেক্ষা শতগুণে রমণীয় ও লোভনীয় কোন স্বতন্ত্র পুরী নির্মাণ করেছেন স্বর্গে ? তাই কিষ্কিন্ধ্যায় আর তোমার রুচি নেই ?'

আবার বললেন, 'তুমি আমার সাহচর্যে হয়ত বীতস্পৃহ হয়েছ, কিন্তু আমার দোষে পুত্র অঙ্গদকে ছেড়ে যাচ্ছ কেন ? হায়, বুঝি নির্মম কালের দ্বারাই চালিত হয়ে সুগ্রীব তোমার মৃত্যুর কারণ হ'ল ! নচেৎ সুগ্রীবের বা ঐ কপট রামের কি সাধ্য তোমাকে বধ করে ! তুমি কেন একমাত্র শরাঘাতে নিহত হবে !'

শোকের প্রাবল্যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী তারার বিলাপের ভাষণ প্রলাপের মতোই অসংবদ্ধ হয়ে উঠল।

ইতিমধ্যে প্রাসাদস্থ পুরনারীরাও তারাকে দুর্গ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে রামের সম্মুখীন হওয়ার পরও বহুক্ষণ জীবিত দেখে, সাহস সঞ্চয় ক'রে ভূতলশায়ী বালীর সন্নিকটে এসেছেন। ওরাও প্রভুর দেহ বেষ্টন ক'রে তারস্বরে বিলাপ ও ক্রন্দন আরম্ভ করলেন। তাঁদের অধিকতর উচ্চ স্বরে ও বক্ষে করাঘাত ক'রে বিলাপের ভঙ্গী দেখে লক্ষ্মণের মনে হ'ল, এঁরা বুঝি তারাদেবীর সঙ্গে শোক প্রকাশের প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হয়েছেন।

এবং, বোধ করি তাঁদের সঙ্গে নিজের শোক প্রকাশের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে গিয়েই তারা অধিকতর উচ্চকণ্ঠে অশ্রু-বিকৃত স্বরে বলে উঠলেন, 'নাথ, তুমি আমাকে ত্যাগ করলেও আমি তোমাকে ত্যাগ করব না। আমি এইখানে প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ ক'রে তোমার সহগমন করব।'

সঙ্গে সঙ্গে তিনি শিলা-কুট্টিমে বার বার ললাটাঘাত করতে লাগলেন।

সুগ্রীব পূর্বেই যৎপরোনাস্তি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়েছিলেন। এক্ষণে তারার এই দুর্দশা দেখে, নিজেকে অপরাধী বোধ ক'রে মস্তক অধিকতর নত করলেন। রামচন্দ্রও এই দৃশ্যের মধ্যে কিছুটা বিব্রত ও দুঃখিত বোধ করছিলেন। কেবল লক্ষ্মণই অস্ফুট স্বরে বললেন, 'নারীজাতির মনের গতিবিধি বোধ করি বিধাতার কাছেও দুর্জ্ঞেয়। এই যে তারা—গগন-স্খলিত তারকার মতোই ভূলুণ্ঠিতা, এঁকে দেখে নিজের প্রত্যক্ষদৃষ্ট অভিজ্ঞতাও অবিশ্বাস্য বোধ হচ্ছে। কে বলবে ইনিই দুই রাত্রি পূর্বে বালীকে ত্যাগ ক'রে সুগ্রীবের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করতে আমাদের উপদেশ দিয়েছিলেন?'

ঘটনাটা বড়ই বিসদৃশ, বেদনাদায়ক ও অযথা বিলম্বিত হচ্ছে দেখে এবার জ্ঞানী হনুমান তারার সমীপবর্তী হয়ে করজোড়ে নিবেদন করলেন, 'দেবী, আপনি অতিশয় বুদ্ধিমতী, সংসারের গতি সম্বন্ধেও আপনার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা। আপনি অবশ্যই জানেন, ইহজগতে মানুষ নিজের কর্মফলেই সুখদুঃখ ভোগ করে। বালীও সেই কর্মফলেই নিহত হলেন। বিচারশূন্য, বিবেচনাহীন ক্রোধ ও স্নেহ দয়া মায়া ক্ষমা প্রভৃতি কোমল বৃত্তির অভাবই সুগ্রীবকে তাঁর শত্রু করেছিল। এ সংসারে সকলেই একদা মৃত্যুমুখে পতিত হবে, সুতরাং সে ক্ষেত্রে একজন মৃত ব্যক্তির জন্য প্রাণত্যাগ ক'রে লাভ কি? জীবিতপুত্রে, আপনি মৃত পতির চিন্তা পরিহার ক'রে জীবিত পুত্রের কথা চিন্তা করুন। অঙ্গদ যাতে তার পিতৃ-রাজ্যের শাসনভার অধিকার করতে পারে এবং সে কার্যের অমর্যাদা না করে—সর্বপ্রথমে আপনার সে দিকেই মনোযোগ দেওয়া উচিত।'

কিন্তু তারা কোন উত্তর দেওয়ার পূর্বেই সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করলেন বালী স্বয়ং।

তিনি এতক্ষণ মৃতের মতোই মুদিত নেত্রে নিস্পন্দ অবস্থায় ছিলেন। এইবার তাঁর অক্ষিপল্লব কম্পিত হতে হতে এক সময় তিনি নেত্র উন্মালনও করলেন। ক্ষীণকণ্ঠে আহ্বান করলেন, 'সুগ্রীব!'

সুগ্রীব ত্রস্তেব্যস্তে নিকটে এসে দাঁড়ালেন। তাঁরও তখন দুই চক্ষু সজল, কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ। কিন্তু বালীরও আর সময় নেই, মৃত্যু নিকটবর্তী, সে ওঁর রক্তধারায় প্রবেশ করেছে এ যেন উনি বেশ অনুভব করছেন। তিনি ঈষৎ কোমল কণ্ঠে পুনশ্চ সম্বোধন করলেন, 'সুগ্রীব, আমি ভাগ্যদোষে চিরদিন পাপপথে চালিত হয়েছি। অহংকারই আমার সকল পাপের মূল নিজের দৈহিক শক্তি সম্বন্ধে অতিরিক্ত অহঙ্কার—তার অবশ্যম্ভাবী ফল বুদ্ধিবিভ্রম। এই বুদ্ধিবিভ্রমেই মানুষ বিনষ্ট হয়। এই বুদ্ধিবিভ্রমের জন্যই আমি অকারণ তোমার প্রতি অবিচার করেছি, তুমি আমার অপরাধ নিও না। অদৃষ্ট আমাদের দু'জনের যুগপৎ সৌহার্দ্য ও রাজ্যসুখ নির্দিষ্ট করেন নি, নাহ'লে এমন বৈপরীত্য ঘটবে কেন? সে যা হোক এখন তুমি এই অরণ্যচারী সরল লোকগুলির শাসনভার গ্রহণ করো, এবং আমি যা করি নি, যথার্থ ধর্মবুদ্ধি ও কল্যাণ চিন্তার সঙ্গে রাজত্ব করো। আমার অন্তিমকাল আসন্ন। এই জীবন, রাজ্য, মহতী শ্রী, প্রতিষ্ঠা, সুন্দরী সঙ্গিনী সকলই ত্যাগ ক'রে চলে যাচ্ছি। এমতাবস্থায় এই শেষ মুহূর্তে তোমার কাছে একটি অনুরোধ জানাচ্ছি, আশা করি দুষ্কর হলেও তুমি তা রক্ষা করবে। এই যে আমার বালক পুত্র অঙ্গদ ধূলিলুণ্ঠিত হয়ে অবিরাম রোদন করছে—এই পুত্রই ইহজীবনে আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়। এ অল্পবয়স্ক, সুখে প্রতিপালিত, সুখেরই উপযুক্ত। তুমি সর্ব অবস্থায় একে নিজ পুত্রবৎ রক্ষা করবে, এবং যখন যা প্রার্থনা করে তাই পূরণ করবে। আজ থেকে তুমিই এর রক্ষক, পিতা ও দাতা। কোন ভয়ের কারণ উপস্থিত হ'লে, তুমি একে অভয়দান করবে। এ

শ্রীমান তোমার তুল্যই মহাবীর, রাক্ষসদের সঙ্গে বিবাদে এ বালক তোমার অগ্রে থাকবে। কালে আমার তুল্যই কীর্তিমান হবে।'

এই পর্যন্ত বলে—কিয়ৎকাল মাত্র নীরব থেকে সেই মৃত্যুপথযাত্রী যেন কিছুটা শক্তি সঞ্চয় ক'রে নিয়ে বললেন, 'আরও একটি অনুরোধ, সুষেণতনয়া তারা বাক্য ও ঘটনা-প্রবাহের সূক্ষ্মার্থ নির্ণয় করতে এবং বিপদের সময় সৎ-পরামর্শ দিতে অদ্বিতীয়া। ইনি যা শ্রেয়ঃ বলবেন, নিঃসংশয়ে তাই ক'রো। এক্ষণে এই ইন্দ্রদত্ত স্বর্ণ-হার তুমিই কণ্ঠে ধারণ করো, এ হার তোমাকে জয়শ্রীমণ্ডিত করুক।'

সুগ্রীব সজল নেত্রে সে হার গ্রহণ করলেন। তাঁর অনুচররাও এবার পূর্ববৈর বিস্মৃত হয়ে প্রকাশ্যেই রোদন করতে লাগলেন।

অতঃপর বালী ইঙ্গিতে অঙ্গদকে একেবারে বক্ষের নিকট আহ্বান ক'রে ক্ষীণতর কণ্ঠে বললেন, 'বৎস, এখন থেকে দেশ কাল বুঝে চলবে। ধৈর্যের সঙ্গে বিনয়ের সঙ্গে সুখ-দুঃখ সমান ভাবে সহ্য ক'রে, ইষ্ট অনিষ্ট উপেক্ষা ক'রে সুগ্রীবের অনুবর্তী ও বশম্বদ থাকবে, তাঁকে পিতৃজ্ঞানে সেবা করবে। লালিত হওয়ার কাল তোমার বিগত, এখন সেবার সময়। লোভ কাম প্রভৃতি প্রবৃত্তি দমন করবে, সুগ্রীবের সঙ্গে অতি প্রণয় বা অপ্রণয় ক'রো না, উভয় দোষের মধ্যপথ ধরে চলবে।'

বলতে বলতেই বালীর চক্ষু ঊর্ধ্বে প্রবিষ্ট হ'ল, মুখগহ্বর ব্যাদত্ত হয়ে স্থির হয়ে গেল—তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

আবারও একপ্রস্থ হাহাকার, উচ্চরব ক্রন্দন এবং বিলাপ।

বৃষ বিনষ্ট হলে সিংহসঙ্কুল অরণ্যে গো-সকলের যে অবস্থা হয়, বালীর সেবিকাদেরও সেই অবস্থা হ'ল।

ইতিমধ্যে নল বালীর গাত্র-সংলগ্ন অন্তঃপ্রবিষ্ট তীক্ষ্ণ তীর উদ্ধার করলেন, তার ফলে পুনশ্চ প্রবল বেগে জলধারার মতো রক্ত নির্গত হতে লাগল। সে রুধির তারার দেহ ও বস্ত্র রঞ্জিত ক'রে অস্তসূর্যের আভায় তাঁকে যেন নবীন মহিমা দান করল।

এদিকে সুগ্রীব রামের নিকট গিয়ে সমধিক অনুতাপে ও দুঃখে যেন ভেঙে পড়লেন। এতকালের দুঃখ অপেক্ষা বালীর সস্নেহ মিনতিপূর্ণ বাক্যই তাঁর অধিকতর দুঃসহ বোধ হ'ল। কবিহৃদয় কোমল-প্রাণ রামও বিষম দুঃখিত হলেন, এদের কীভাবে সান্ত্বনা দেবেন, ব্যাকুলভাবে সেই চিন্তাই করতে লাগলেন।

চারিদিকে এই বিশৃঙ্খলা ও বিমূঢ়তা দেখে বাস্তববুদ্ধি লক্ষ্মণ এবার নিজ হস্তে ঘটনার চালনরশ্মি ধারণ করলেন।

সুগ্রীবের স্কন্ধে হস্তার্পণ ক'রে বললেন, 'সখা সুগ্রীব, তুমি পুরুষ এবং বর্তমানে রাজ্যপ্রধান, স্ত্রীলোকের ন্যায় শোকে বিহ্বল হওয়া ও কেবলই পরিকল্পিত কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করা তোমাতে শোভা পায় না। তুমি তারাদেবী ও অঙ্গদকে নিয়ে বালীর অগ্নি-সংস্কার করো। প্রচুর শুষ্ক কাষ্ঠ লাগবে—কিছু চন্দন কাষ্ঠও—এখনই সেগুলি সংগ্রহ ও আনয়নের আজ্ঞা দাও। অঙ্গদ পিতৃশোকে সাতিশয় কাতর হয়েছেন, তুমি স্নেহের সঙ্গে ওঁকে আশ্বস্ত করো ও এখনই প্রতিশ্রুতি দাও যে উনি অচিরে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবেন। এ রাজ্য ও পুরী এক্ষণে তোমার, তুমি আর কাষ্ঠবৎ জড় হয়ে থেকো না। শ্রীমান অঙ্গদ পিতৃবিয়োগ-ব্যথা পরিহার ক'রে মাল্য বস্ত্র ঘৃত তৈল গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি আনয়নের ব্যবস্থা করুন, বাহকগণকে আদেশ দাও, তারা মহার্ঘ্য ও সুসজ্জিত শিবিকায় বালীর শবদেহ উপযুক্ত সম্মানের সঙ্গে বহন ক'রে নদীতীরে নিয়ে যাক।'

এতক্ষণ কে কী করবেন, কী করা উচিত, মৃতদেহ সৎকারের প্রসঙ্গ প্রথম কে উত্থাপন করবেন স্থির করতে না পেরে উপস্থিত সকলেই শোকের আবরণে নিষ্ক্রিয় উদাসীন ছিলেন। অথচ সৎকার না হলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা আরম্ভ হবে না, সে বিষয়েও সচেতনতার অভাব ছিল না—এখন লক্ষ্মণের স্বভাব-কর্তৃত্বের ভঙ্গীতে ও দৃঢ় কণ্ঠস্বরে সক্রিয় হয়ে উঠতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই উত্তম সুগন্ধী দ্রব্য, শয্যা ও পুষ্পমাল্য প্রভৃতির দ্বারা সুশোভিত শিবিকা এল। ওদিকে আর একদল কর্মী বালীর বিশাল দেহের উপযুক্ত সুবিস্তৃত চিতাশয্যা রচনা করতে লাগলেন। অন্ততঃ সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে যাতে সে চিতায় অগ্নিসংযোগ করা যায়, সেই জন্যই সকলে প্রাণপণে পরিশ্রম করতে লাগলেন।

তারা তখনও বালীর দেহকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ ক'রে শবদেহের বক্ষে মস্তক রক্ষা ক'রে বিলাপ ক'রে যাচ্ছেন। সে আলিঙ্গন শিথিলিত না হলে দেহকে শিবিকায় তোলা যাবে না।

পুরনারীদের সাহায্যে নল প্রায় বলপূর্বক তারার বাহুশৃঙ্খল মোচন ক'রে বালার দেহ শিবিকায় তুললেন। এবং লক্ষ্মণের দৃষ্টির ইঙ্গিত অনুসরণ ক'রে অঙ্গদ প্রভৃতি বীরগণ অপর বাহকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে শিবিকা-স্কন্ধে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নদীতীরের দিকে ধাবিত হলেন। সুগ্রীবও আর কালবিলম্ব না ক'রে তাদের অনুসরণ করলেন। বস্তুতঃ স্বল্পকালের মধ্যেই এতক্ষণের জনাকীর্ণ মল্লভূমি প্রায় জনহীন হয়ে গেল।

তারাও বিস্রস্ত বসনে, স্খলিত কেশে শিবিকারই অনুসরণ করছিলেন, দৈবাৎ রামচন্দ্রের প্রস্তর-স্থির মূর্তির দিকে তাঁর দৃষ্টি নিপতিত হ'ল।

অকস্মাৎ যেন তাঁর সুচারু নয়নের সুগভীর আবেগপূর্ণ দৃষ্টিতে দিকদাহী অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। তিনি রামের নিকটে গিয়ে ক্রোধ-তীব্র স্বরে বললেন, 'কপট রাজকুমার, আমার প্রভুকে ভর্তাকে বধ ক'রেই ক্ষান্তি দিলে কেন? আমাকেও বধ করো, আমি বক্ষ অনাবৃত করে দিচ্ছি'—বলতে বলতেই তারা দেবী কঠোর-তপস্বীরও-সাধনাভঙ্গকারী অপ্সরানিন্দিত বক্ষ অনাবৃত করলেন, 'আর সেই সঙ্গে কুমার অঙ্গদকেও। তোমার বন্ধু সুগ্রীবের রাজসিংহাসন নিষ্কণ্টক হোক। অন্যায়ভাবে আমার প্রভুকে বধ করেছ—সে বিচার বিধাতা করবেন। আমি তার জন্য তোমাকে অভিশাপ দেব না। শুধু মিনতি

করছি, ঐ রক্তাক্ত শরই তোমার হিংস্র ধনুতে সংযোজিত ক'রে আমাকেও বধ করো। এটা দয়া হিসাবেই ভিক্ষা করছি, আমাকে বালীরই আত্মা বোধ ক'রে শর নিক্ষেপ করো। স্ত্রীবধের পাতক তোমাকে স্পর্শ করবে না।'

এবার রামচন্দ্রের অনিন্দ্য আননে এক বিচিত্র সকৌতুক হাস্য ফুটে উঠল। তিনি প্রসন্ন কোমল কণ্ঠে বললেন, 'চন্দ্রাননে, তুমি অভিশাপ দিলেও তা আমার কোন ক্ষতি করত না। তার কাবণ তোমার অন্তরকেই জিজ্ঞাসা করো। তোমার এতাদৃশ শোকেরও কোন যুক্তি নেই। আমি জানি, তুমি বালীর রাজত্বকালেও যেমন কিষ্কিন্ধ্যার কর্ত্রী ছিলে, সুগ্রীবের কালেও তেমনই থাকবে। বরং সুগ্রীবই তোমার কর্তৃত্বাধীন থাকবেন। তিনি তোমাতে অনুরক্ত, তুমিও সুগ্রীব সম্বন্ধে বীতস্পৃহ নও। আমি সুগ্রীবকে অনুরোধ করব—তাঁর অভিষেকের সময়ই তিনি অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবেন।

'চারুহাসিনী, তোমার এ শোক সত্য হলেও সাময়িক, বালীর বিরহবেদনা তুমি অচিরেই বিস্মৃত হবে। পরন্তু আমি আশীর্বাদ করছি, তুমি সুখী হবে, তৃপ্ত হবে। বালীর মৃত্যুতে তোমার যেটুকু প্রেরণা ছিল, লোকে তা স্মরণে রাখবে না। কালক্রমে ভারতের ইতিহাসে তুমি মহীয়সী নারী রূপেই পরিচিত হবে।'

॥ উপসংহার ॥

সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক উৎসব সমাপ্ত হতে হতেই আকাশে মেঘসজ্জা দেখা দিল। অর্থাৎ বর্ষাকাল সমাগতপ্রায়।

এই নবনীরদ শোভায় নিদাঘদগ্ধ সকল প্রাণীই পুলকিত ও তৃপ্ত হলেন। প্রখর তপন জলদে আবৃত হয়ে দিবাভাগেই সন্ধ্যারাগের শোভা ধারণ করল। তার প্রান্তভাগ পাণ্ডুর। যেন মেঘরূপ ছিন্নবস্ত্র দিয়ে সূর্যের প্রখর দীপ্তি আচ্ছাদনের চেষ্টা চলছে। পৃথিবী এতদিন উত্তপ্ত ছিলেন, এক্ষণে মেঘদর্শনে আশ্বস্ত ও স্নিগ্ধ হয়ে এতদিনের উষ্মা ত্যাগ করলেন। বায়ু মৃদু ও মন্দ, কেতকী-গন্ধী ও কর্পূরসংস্পর্শী শীতল, সে বায়ু যেন অঞ্জলি ভরে পান করা যাচ্ছে।

তবে এর সৌন্দর্য ও উপভোগ্যতা যেমন, কাব্যে যার বর্ণনা মধুর বোধ হয়, বিপদের বাস্তব দিকটাও তেমনি স্বল্প নয়।

এ ভূভাগের চতুর্দিকে বহুদূর পর্যন্ত অরণ্য ও পর্বতবহুল। গ্রীষ্ম বা শীতেও এখানকার পথ বিপজ্জনক ও দুর্গম—বর্ষায় তা অগম্য হয়ে ওঠে, বিপদের ভয়ও বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

সে কারণেই সকলে পরামর্শ ক'রে স্থির করলেন, বর্ষার কাল বিগত হয়ে শরতের সমাগম হ'লেই সুগ্রীব চতুর্দিকে চর প্রেরণ করবেন সীতার সংবাদের জন্য। জ্ঞাত অজ্ঞাত সকল দেশেই বহুসংখ্যক চর প্রেরিত হবে। এবং প্রতি দলের সঙ্গেই একজন বিচক্ষণ নেতা থাকবেন। যতক্ষণ না তাঁর বার্তা পাওয়া যায়, ততক্ষণই এ অনুসন্ধান কার্য চলবে।

এই দুই তিন মাস রামকে প্রাসাদে বাস করার জন্য সুগ্রীব বিস্তর অনুনয় করলেন, কিন্তু রামচন্দ্র সম্মত হলেন না। এখনও চতুর্দশ বর্ষ অতিক্রান্ত হয় নি, তাঁর ব্রহ্মচর্য ব্রত ত্যাগ করা সম্ভব নয়। এ সময় গৃহীদের সঙ্গে প্রাসাদে বাস করলে সত্য ভঙ্গ হবে।

সুতরাং স্থির হ'ল, নিকটেই রমণীয় প্রস্রবণ পর্বত, তারই এক স্বাভাবিক গুহায় ওঁরা এই বর্ষাকাল অতিবাহিত করবেন। এবং পূর্ববৎ ফলমূল ও সুপাচ্য মাংস গ্রহণ ক'রে জীবনযাপন করবেন।

প্রস্রবণ পর্বত এমনিতেই খুব রমণীয়—বর্ষায় তার শোভা শতগুণ বৃদ্ধি পেল।

গহন তরুলতাগুল্ম আবৃত থাকায় এই সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গটিকে সর্বদাই মেঘনীলবর্ণ বোধ হয়। এখন স্বাভাবিক নীল মেঘের সমাবেশে ও ক্ষণে ক্ষণে নব নব নীরদ সঞ্চারে সে পর্বতের নীলাভতা যেন গাঢ় নীলবর্ণ ধারণ করল।

যে গুহাটি ওঁরা বসবাসের জন্য নির্বাচন করেছিলেন সে গুহার প্রবেশ দ্বার অভ্যন্তর ভাগের প্রসারতার অনুপাতে ঈষৎ অপ্রশস্ত; গুহাটি সমতল নয়, ঈশান দিকে যেন স্তরে স্তরে দ্বিতল ত্রিতল এই ভাবে উন্নত হয়েছে, অথচ গুহার উচ্চতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নি। সে কারণে সুখস্পর্শ শীতল বায়ুর অভাব হয় না, কিন্তু বর্ষার পূর্বাগত বায়ু কি জলকণা এদের সিক্ত কি বিব্রত করতে পারবে না। চতুর্দিকে যে অগণিত শিরীষ, কদম্ব, অর্জুন ও শালবৃক্ষ—তাদের সুগন্ধী শুষ্ক পত্র আহরণ ক'রে উচ্চতর অন্তর্গুহায় উত্তম শয্যা রচনা করা যাবে।

বস্তুত এ যেন এক উদ্যানবাটিকায় ওঁদের মানসিক শ্রান্তি অপনোদনের জন্য স্বয়ং বিধাতা নির্মিত উদ্যানাবাসের ব্যবস্থা। নতুবা গুহাদ্বারে সম্মুখে এমন প্রশস্ত মসৃণ সমতল শিলাখণ্ড রেখে দেবেন কেন? শিলাটি এই পর্বতগাত্রের থেকে ভিন্ন, দলিত অঞ্জনস্তূপের মতো কৃষ্ণবর্ণ। শিলাখণ্ড না বলে শিলাসন বলাই উচিত তাকে।

মধ্যে মধ্যে বর্ষণক্ষান্ত আকাশ যখন প্রখর সূর্যকিরণ কি উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে উৎভাসিত হয়, চতুর্দিকের শোভা অধিকতর রমণীয় ক'রে তোলে, তখন সেখানেই উপবিষ্ট হয়ে রামচন্দ্র কাব্যমুখর হয়ে ওঠেন, আবার সে কাব্যের সৌকুমার্য এক এক সময় তাঁর বিরহ-যন্ত্রণাকেই দ্বিগুণিত করে তোলে।

এই শিলাস্থলে বসে দূর উত্তর দিকে তাকালে একটি সুন্দর গিরিশৃঙ্গ নয়নগোচর হয়—তা অপরাপর শৃঙ্গ থেকে ভিন্ন, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ নীল কজ্জলের শৃঙ্গ বোধ হয় এখান থেকে, মনে হয় সমগ্র শৃঙ্গটি মেঘ-

নির্মিত—যেমন সমতল ক্ষেত্রেও দূর চক্রদিগন্তে মেঘসজ্জা দেখে পর্বত বলে ভ্রম হয়। আবার ঠিক দক্ষিণের শৃঙ্গটি এর বিপরীত—তুষার শুভ্র—না, এতই মসৃণ যে রজতনির্মিত বলে ভ্রম হয়। এটি যেন কৈলাস শিখরের নব-দেহান্তর। আর এই যে গুহার সম্মুখে নিম্নে স্বচ্ছতোয়া নদীটি—ওটিকে এই কারণেই স্বর্গ-স্রোতস্বিনী মন্দাকিনী বলে প্রতীতি জন্মায়।

নদীটি যেন শুধু সুন্দরীই নয়—ওর উভয় তীরে চন্দন, অশোক, পদ্মক, বকুল, কেতক, বেতস প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর বৃক্ষগুল্মে সজ্জিত হয়ে সুবেশা নর্তকীর মতো নৃত্যরতা।

কী অপরূপ বর্ণোৎসব চারিদিকে! পর্বতগাত্রগুলি যেমন বিভিন্ন ধাতুতে বিচিত্রবর্ণ, অরণ্য যেমন বিবিধ পুষ্পবৃক্ষে বর্ণোন্মত্ত, নদীনীরে ও নদীতীরে তেমনি নীলোৎপল রক্তোৎপল, শ্বেতপদ্ম, কুমুদ কহ্লার—ময়ূর, ক্রৌঞ্চের শোভা।

গুহার অদূরেই একটি স্বচ্ছতোয়া সরোজ-শোভিতা সরোবর আছে, গুহার মধ্যেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী অজস্র। সুতরাং সুস্বাদু পানীয় জলের অভাব নেই।

এ পর্বতে যেমন সিংহ শার্দুল ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র পশু আছে, তেমনি সুন্দর সুকণ্ঠ পক্ষী ও মৃগ শশক প্রভৃতি নিরীহ প্রাণীরও প্রাচুর্য। চন্দন, সর্জ, অর্জুন প্রমুখ বৃক্ষের জন্য এখানে বাতাস সদা-সুগন্ধী। পর্বতটি বহু ধাতুর আধার, সেজন্য পর্বতগাত্র ও স্খলিত প্রস্তরখণ্ডগুলি বিভিন্ন বর্ণের, তাতে নীলকজ্জল মেঘের সমাবেশ হওয়ায় শৃঙ্গগুলি অপূর্ব শোভা ধারণ করেছে।

বাস করার পক্ষে অপূর্ব স্থান সন্দেহ নেই। মনে অশান্তি না থাকলে রামচন্দ্র বোধ করি এ স্থানেই চিরদিন বাস করতেন। রাজ্য বা ঐশ্বর্যের ভোগবিলাসও তাঁকে প্রলোভিত করতে পারত না।

কিন্তু জানকীর অদর্শনে, তাঁর কুশল সংবাদের অভাবে নিসর্গের এই অপরূপ বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য তাঁর কাছে দ্বিগুণ বেদনাদায়ক হয়ে পড়ছে।

যাঁর সঙ্গে একত্রে এই সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারলে সুখের সীমা থাকত না, তাঁর বিরহে, কামযন্ত্রণায় এসকল বিষবৎ বোধ হচ্ছে।

তাই কখনও বা একমাত্র সঙ্গী লক্ষ্মণের কাছে চতুর্দিকের সৌন্দর্য বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছেন, কখনও বা বিলাপে ভেঙে পড়ছেন।

তথাপি, সব দুঃখেরই একদা অবসান ঘটে।

বর্ষাও এক সময় শেষ হ'ল। নব শরতের বনভূমি হরিতে হিরণে অপরূপা হয়ে উঠল।

রাম আশা করছিলেন, এবার সুগ্রীব সক্রিয় হয়ে উঠবেন। তাই সারাদিন উৎকণ্ঠ হয়ে দূর কিষ্কিন্ধ্যাব দিকে চেয়ে থাকেন, কোন কর্ম-চাঞ্চল্য জনসমাবেশ বা দূর-যাত্রার আয়োজন দেখা যায় কিনা।

কিন্তু সে উদ্বিগ্ন প্রতীক্ষা প্রতিদিনই ব্যর্থ হয়। কিছুই দেখা যায় না। সমস্ত পুরী যেন সুখসুষুপ্ত।

এইভাবেই সুদীর্ঘ ও অসহ প্রতীক্ষায় দিন কাটে। একটি রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রভাতের সঙ্গে একটি সুখদ রজনী যুক্ত হয়। আবার রাত্রিশেষে আশা ও আনন্দের আভাস নিয়ে জ্যোতির্ময় রবির আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু রামচন্দ্রের জীবনে প্রভাত বা দিন বলতে কিছু নেই, সমস্তই আশাহীন অন্ধকার। ক্রমেই তিনি বিষণ্ণ ও ক্ষণে ক্ষণে চিন্তা বা সমাধি মগ্ন হয়ে পড়েন।

কিন্তু রামচন্দ্রের মতো অখণ্ড ধৈর্য লক্ষ্মণের নেই। তিনি রামচন্দ্রের মতো ক্ষমাপরায়ণও নন। ক্রমশঃ তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। একদা অতিশয় বিরক্ত হয়ে উঠে বলেন, 'সুগ্রীব ঘোর অকৃতজ্ঞ। তার সঙ্গে মধুর সম্পর্ক রাখা আর সম্ভব নয়। যে যেমন, তার প্রতি তেমন ব্যবহারই সঙ্গত। আপনি অপেক্ষা করুন, আমি কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়ে তাকে সমুচিত শিক্ষা দিচ্ছি।'

এই বলে তিনি ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে

ফেলতে রোষলোহিত বর্ণ ধারণ ও শরাসন গ্রহণপূর্বক কিষ্কিন্ধ্যা অভিমুখে যাত্রা করলেন।

কিষ্কিন্ধ্যা সত্যই সুখসুষুপ্ত ছিল।

বালী শুধু প্রচণ্ড ক্রোধী বা অমিতবলশালীই ছিলেন না, দক্ষ প্রশাসকও ছিলেন। তিনি বিলক্ষণ জানতেন—রাজকর্মচারীদের কর্মশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে বা দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর ক'রে তুলতে হ'লে তাদের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রাকেও কিছু নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।

সেজন্য তাঁর কতকগুলি নীতি ও নিয়ম নির্দিষ্ট ছিল, এবং এমনই তাঁর সম্বন্ধে সকলের আতঙ্ক যে, তিনি নিজে ভোগবিলাসে নিমজ্জিত থাকলেও কোন রাজপুরুষ বা রাজ্যপ্রধানই সে নীতিকে বিন্দুমাত্র অবহেলা কি শৈথিল্য প্রদর্শন করতে সাহস করতেন না।

সেজন্য ঐশ্বর্যের মধ্যে বাস করলেও তাঁরা সম্পদের সে সুখ পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করতে সাহস করতেন না, কতকটা সংযত জীবনযাত্রাই যাপন করতে হ'ত।

কিন্তু সুগ্রীব অন্য প্রকৃতির মানুষ। রাজকার্য বা জীবন সম্বন্ধেও তাঁর চিন্তা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের।

স্বল্পায়ু মানুষ, আনন্দের উপকরণ বিস্তর।

সুখ সম্ভোগের সুযোগ থাকতে তা গ্রহণ না ক'রে জীবন কেবল কঠোরতা দুশ্চিন্তা এবং সংঘর্ষ কি যুদ্ধবিগ্রহে অতিবাহিত করবে কেন মানুষ ?

আনন্দ বা সুখের উপলক্ষ কি কারণ এবং ধারণা সকলের এক প্রকার না হতে পারে। তা যার যেমন স্বপ্ন-কল্পনা আশা সেই ভাবেই সে আনন্দ লাভ করুক না! ক্ষতি কি ?

তিনি চান সুরা, সঙ্গীত ও সুন্দরী। তার অভাব নেই। তিনি আর অধিক কিছু চান না। অপরে কি ভাবে জীবনকাল অতিবাহিত বা এই জীবন উপভোগ করতে চায়, সে সম্বন্ধেও বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য নেই তাঁর। তাঁর এই ভোগসুখে কেউ অন্তরায় না হ'লেই তিনি সুখী।

তিনি আরও নিশ্চিন্ত এইজন্য—ছুঃখের দিনগুলি তাদের সাহায্যে ও সাহচর্যে অতিবাহিত ক'রে দেখেছেন, সুখের দিনেও নানাভাবে তাদের মনের পরিচয় লাভ করেছেন—তাঁর রাজ্যপ্রধান বা অমাত্যরা সৎ, তাঁকে সত্যই স্নেহ করেন। সুতরাং অযথা তাদের পীড়ন বা তাদের উপর কঠিন নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করবেনই বা কেন?

তারাও সুখে শান্তিতে কালযাপন করুক, তাঁকেও করতে দিক।

অমাত্যরা তাই-ই করছিলেন। নিজ নিজ হর্ম্য নবভাবে বিপুল সম্পদশ্রীতে সজ্জিত ক'রে—কোন কোন ক্ষেত্রে পুনর্গঠিত ক'রে—ফুল ফল প্রভৃতি বৃক্ষসম্ভারে তা সুরম্য ক'রে, সুস্বাদু আহার্য ও সুপেয় মদ্য ভাণ্ডার পূর্ণ রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে আরামে আলস্যে কাল অতিবাহিত করছিলেন।

আর সত্যই, ব্যস্ত হওয়ার কি উৎকণ্ঠা বোধ করার আশু কোন কারণও তো লক্ষিত হচ্ছে না। গুপ্তচররা যা সংবাদ আনছে তাও অনুকূল। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের সুগ্রীব-মিত্ররূপে এই আকস্মিক আবির্ভাবে এবং রাজধানীর সন্নিকটে আবাস-স্থাপনে—বানর-রাজ্যের যারা চিরশত্রু দানব পিশাচ ও রাক্ষসজাতি রীতিমতো ভীত ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। বালীকে যারা অনায়াসে বধ করতে পারে তাদের অসাধ্য কি আছে?

সুতরাং অমাত্যগণের কোন দুর্ভাবনার কারণ কোথাও নেই, তাঁরা তো সুখসুপ্তবৎ থাকবেনই!

তবে প্রধানরা অধিকাংশ নিজ কর্তব্য বিস্মৃত হলেও একজন হন নি।

তিনি মহাবীর হনুমান।

শরতের আভাস মাত্রেই জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ হনুমান যে সুগ্রীবকে সচেতন করার প্রয়াস পান নি তা নয়। কিন্তু প্রতিবারই সুগ্রীব মধুর স্তোকবাক্যে নানা অছিলায় কর্মারম্ভের দিনটিকে অনাগত অনির্দিষ্ট কালের দিকে ঠেলে দিয়েছেন।

আদিকবি বাল্মীকির ভাষায়, 'তাঁহার মনোরথ পূর্ণ। তিনি রুমা, তারা প্রভৃতি রমণীগণকে লইয়া দিনযামিনী সুখে অতিবাহিত করিতেছেন, যেন সুররাজ ইন্দ্র অপ্সরাগণ-মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। স্বয়ং নিশ্চিন্ত, রাজ্যশাসনভার মন্ত্রীগণের হস্তে অর্পিত, তিনি উহাদের কার্য পরীক্ষায় উদাসীন, বিশ্বাসে নিঃশংসয় আছেন। ধর্ম বা অর্থ সংগ্রহে তাঁহার মতি নাই। তিনি ভোগপথ আশ্রয় করিয়া নিরন্তর নির্জনে লালসা চরিতার্থ করিতেই অভিলাষী।'

কিষ্কিন্ধ্যা তথা সুগ্রীবের সে সুপ্তিভঙ্গ হ'ল লক্ষ্মণের আকস্মিক আগমনে।

এ আগমনকে বুঝি আক্রমণ বলাই যথার্থ।

কিষ্কিন্ধ্যাপুরীর সাধারণ বানর অধিবাসীরা প্রথমটা তাঁকে বাধা দেবারই মনস্থ করেছিল। কিন্তু সাক্ষাৎ কালদর্শন যুগান্তভীষণ লক্ষণকে ও তাঁর হস্তধৃত বিশাল ভয়ঙ্কর ধনু দেখে আর্তনাদ করতে করতে পলায়ন করল।

দু'একজন তাদের মধ্যে সুগ্রীবের ভবনে গিয়ে জাগ্রত ক'বে এই আকস্মিক বিভীষিকাময় উপস্থিতি সংবাদ দেবারও চেষ্টা করল। কিন্তু সুগ্রীব তখন অতিরিক্ত সুরাপান ও রমণী সম্পর্কিত অমিতাচারের ক্লান্তি অপনোদনের সুগভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন, পরিজনদের করুণ ভয়ার্ত কণ্ঠের স্বরে সে নিদ্রাভঙ্গ হবে কেন?

সংবাদ পেয়ে কুমার অঙ্গদ ভীতিকম্পিত দেহে এসে করজোড়ে লক্ষ্মণকে স্বাগত জানাবার একটা চেষ্টা করলেন। কিন্তু লক্ষ্মণের তখন প্রতি-সৌজন্য প্রকাশের মতো মনোভাব নয়। তিনি জলদগর্জনে বললেন, 'তোমার পিতৃব্য রামচন্দ্রের সঙ্গে মিথ্যাচরণ করেছেন। রামচন্দ্র অপবাদের আশঙ্কা না ক'রে ওঁর ভ্রাতা বালীকে বধ ক'রে ওঁর সিংহাসন-প্রাপ্তি ঘটিয়েছেন। কিন্তু সুগ্রীব সে ঋণশোধের জন্য আদৌ চেষ্টিত নন। এর ফল ওঁর পক্ষে শুভ হবে না। তুমি গিয়ে তোমার পিতৃব্যকে আমার এ বক্তব্য জানাও।'

অঙ্গদও যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন, কিন্তু সুরাচ্ছন্ন কামমোহিত সুগ্রীব অতি কষ্টে নেত্র উন্মীলিত করলেও অঙ্গদের বাক্য তাঁর শ্রুতিগোচর বা মস্তিষ্কগোচর হ'ল না। তিনি তৎক্ষণাৎ পুনশ্চ নিদ্রাভিভূত হলেন।...

অঙ্গদের মুখে অবস্থার বিবরণ শুনে লক্ষ্মণ আর দ্বিধা করলেন না। তিনি প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন।

এই প্রাসাদদুর্গের মধ্যে বিবিধ ভবন, কিছুটা স্বাভাবিক গুহাকে হর্ম্যে রূপান্তরিত করা, কিছুটা প্রস্তর দ্বারা নির্মিত। এই সব আবাসের উৎকৃষ্টগুলি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বা রাজপুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট। অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গয়, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, বিদ্যুন্মালী, সম্পাতি, হনুমান, বীরবাহু, সুবাহু, নল, সুষেণ (তারাদেবীর পিতা), তার, জাম্ববান, নীল, দধিবক্র প্রভৃতি প্রধানতর।

গৃহগুলি মনোরম, বিশাল ও সুদৃশ্য। ধনধান্যে সমৃদ্ধ, সুগন্ধি পুষ্প-মাল্যে সজ্জিত, উত্তম উত্তম ফলবান বৃক্ষবহুল, সর্বাঙ্গসুন্দরী সুবেশা রমণীগণে পূর্ণ।

লক্ষ্মণ এইসব আবাসগুলি অতিক্রম ক'রে সুগ্রীবের নিজ প্রাসাদে উপনীত হলেন।

বহিঃপ্রাসাদের মূল্যবান আসন ও নানাবিধ সুসজ্জায় শোভিত পর পর সাতটি মহল অতিক্রম ক'রে লক্ষ্মণ এক সময় অন্তঃপুরের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হলেন।

দেখলেন সম্মুখের বিস্তীর্ণ গৃহ মহার্ঘ্য সজ্জা, সুদৃশ্য আস্তরণ ও বিস্তৃত সুকোমল শয্যায় শোভিত। সে গৃহে অগণিত সদ্বংশোদ্ভূতা, যৌবন-গর্বিতা, সুরুচিসম্মতবেশা, সালঙ্কারা রমণী, কেহ বা পুষ্পমাল্য রচনায় ব্যাপৃত, কেহ বা তান-লয় সমন্বিত মৃদঙ্গ বাদ্যের সঙ্গে বীণাবাদন করছেন। কেহ বা শুধুই অলসভাবে দর্পণে নিজের রূপযৌবন নিরীক্ষণ করছেন। স্থানে স্থানে পুরুষ অনুচরণকে দেখা গেল, তাদের পরিচ্ছদ অপরিচ্ছন্ন, মুখভাব ক্লান্ত, গৃহকর্মে তাদের কোন উৎসাহ বা প্রবৃত্তি নেই।

অর্থাৎ তাদেরও বিগত রজনীর বিলাস-ব্যসন-সম্ভোগ উন্মাদনার ক্লান্তি অপগত হয় নি।

এ দেখে লক্ষ্মণ স্বভাবতঃই লজ্জিত বোধ করলেন। এদের সঙ্গে সম্ভাষণে তাঁর রুচি হ'ল না। নিজের আগমন বার্তা ঘোষণার অন্য উপায় না দেখে তাঁর সেই প্রলয়ান্তকারী কার্মুকে টঙ্কার দিলেন। সে টঙ্কারের ধ্বনি এ প্রাসাদ, সমগ্র পুরী কম্পিত ক'রে যেন সুদূর শৈল-শিখরে আঘাত ক'রে প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করল।

এইবার সুগ্রীবের সুরা-বিহ্বলতা এবং রতিরণক্লান্তি দূর হ'ল। তিনি ত্রস্ত ও চমকিত হয়ে শয্যায় উঠে বসলেন ও চিরদিনের নির্ভররূপা তারাদেবীর দিকে অসহায় ভাবে চাইলেন।

তারাদেবী তাঁর সন্ত্রস্ত অবস্থা দেখে ঈষৎ হাস্য করলেন।

প্রশ্রয় ও অভয়ের হাসি।

তার পর শয়নকক্ষ ত্যাগ ক'রে অন্তঃপুরের প্রবেশপথের দিকে অগ্রসর হলেন।

তার পূর্বেই নূপুরধ্বনি ও কাঞ্চীরব তুলে কিছু কৌতূহলী বিলাস-সঙ্গিনী সেখানে সমবেত হয়েছিল, তারাদেবীকে দেখে তারা সভয়ে পথ ছেড়ে দিল। তিনি লক্ষ্মণের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন।

লক্ষ্মণ ইতিপূর্বেও সুন্দরীশ্রেষ্ঠা সুরনারীনিন্দিতা তারাকে দেখেছেন—সুসজ্জিতা সুচিত্রিতা অবস্থায়—কিন্তু এ আজ কাকে দেখছেন ?

সুরারক্ত চক্ষু দুটি তখনও অর্ধনিমীলিত, পরিধেয় বস্ত্রের অঞ্চল ভূলুণ্ঠিত, বেণী আলম্বিত, বক্ষ অর্ধ-অনাবৃত, সুপুষ্ট স্তনভার সন্নত। গতি স্খলিত ও কণ্ঠস্বর জড়িত।

ওঁকে এ অবস্থায় দেখে লক্ষ্মণ চক্ষু নত করলেন। কিন্তু তারা নিজের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন নন। তিনি কতকটা প্রণয় নিবেদনের ভঙ্গীতে বললেন, 'প্রিয় রাজকুমার, এ তোমার আজ কী মূর্তি! আমি ভাবলাম, এতদিন পরে বুঝি তোমার সুমতি হয়েছে, তুমি আমাদের-আতিথ্য নিতে এসেছ। উৎকৃষ্ট খাদ্য, অপর্যাপ্ত মদ্য এবং অগণিত রমণী তোমার এই

আগমনেরই অপেক্ষা করছে গত কয়েক মাস। কিন্তু তুমি ক্রুদ্ধ কেন? এবং কার্মুক ধারণেরই বা প্রয়োজন কী? শমন কার নিকটবর্তী হ'ল? এমন হতভাগ্য কে—তোমার ক্রোধের উদ্রেক করল?'

লক্ষ্মণ এতক্ষণে লজ্জা জয় করেছেন, তিনি নিঃসঙ্কোচে তারার দিকে চেয়ে বললেন, 'তারা, তোমার স্বামী কামের বশীভূত, মদ্যপ, ধর্মদৃষ্টি-বিবর্জিত। তিনি নিকৃষ্ট সঙ্গীদের নিয়ে ইন্দ্রিয়সুখে নিমগ্ন। আমাদের অবস্থা একবারও চিন্তা করছেন না। নিরন্তর কামচরিতার্থ প্রয়াস ও মদ্যপান আদৌ সুস্থ নয়, এর প্রভাবে ধর্ম ও অর্থ দুইই বিনষ্ট হয়। অকৃতজ্ঞতায় ধর্ম লোপ পায় এবং শক্তিমান মিত্রের সঙ্গে অসদ্ভাবে অর্থ বা ঐহিক প্রতিষ্ঠানাশ অবশ্যম্ভাবী। আমরা ওঁর এই ব্যবহার সহ্য করব না। তুমি সুগ্রীবকে গিয়ে একথা জানাও।'

তারা লক্ষ্মণের এই কঠোর বাক্যে ও কঠিন কণ্ঠস্বরে অচিরে প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠলেন। তিনি বেশবাস সংযত করে নিয়ে বিনতভাবে বললেন, 'প্রিয়বর, সুগ্রীব সম্বন্ধে তুমি যা বলেছ, সবই সত্য। কিন্তু নিকৃষ্টের প্রতি উৎকৃষ্টের ক্রোধ শোভা পায় না। সে তোমাদের ক্রোধের অযোগ্য। তবে, এ দুঃখ বা হতাশা তোমাদের প্রাপ্য। তোমরা সুগ্রীবের ওপরই নির্ভর করেছিলে, তোমাদের এই দাসীকে অবহেলা ও অপমান ক'রে। সেইজন্যই আমি দেখছিলাম, কত দিনে তোমাদের শিক্ষা হয়, যথার্থ শক্তির উৎস সম্বন্ধে তোমাদের চেতনা আসে।'

তারপর একটু নীরব থেকে বলেন, 'যাও, তোমার অগ্রজ রামচন্দ্রকে বলো গিয়ে, যাকে তিনি বিদ্রূপ করেছেন, উপেক্ষা করেছেন, মিথ্যাচারিণী ভেবেছেন, সেই তারাই সুগ্রীবের ঋণশোধ করবে। এখন থেকে ষোড়শ প্রহরের মধ্যে চতুর্দিকে বিচক্ষণ অভিজ্ঞ সন্ধানী দল প্রেরিত হবে। সে সব ব্যক্তি নির্বাচন এবং যথাযথ ভার অর্পণ, কে কোন্ দিকে ও কোন্ কোন্ দেশে গিয়ে অনুসন্ধান করবে—সে আমি স্বয়ং ও প্রাজ্ঞ হনুমান স্থির করব। সুগ্রীব আরও দীর্ঘকাল নিদ্রিত থাকলেও এর অন্যথা হবে না।'

এই বলে লক্ষ্মণকে শান্ত ও প্রসন্ন ক'রে আরও নিকটে এসে মধুর হাস্যে বললেন, 'কিন্তু প্রিয় রাজকুমার, তুমি তো তোমার অগ্রজের মতো ব্রহ্মচর্যে প্রতিশ্রুত নও। তুমি অন্ততঃ এক প্রহর এখানে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম এবং চিত্তবিনোদন ক'রে যাও না! ছাখো, সুগায়িকা, উত্তম নর্তকী, তরুণী সুন্দরী নারীর অভাব নেই। সুখাদ্য, সুকোমল শয্যা যেন তোমার জন্যই অপেক্ষা করছে। সামান্য কাল যদি তুমি এখানে থেকে কিছুটা শান্তি ও তৃপ্তিলাভ করো, সেটা কিছু তোমার অগ্রজের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা বলে গণ্য হবে না। ছাখো, অসংখ্য সুন্দরী নারী এখানে আছেন। তুমি যাকে নির্বাচন করবে সে-ই কৃতার্থ হবে। তোমার মনোমত হলে আমি বা রুমাও তোমার সেবা করতে পারি। তাও যদি রুচি না হয়, নৃত্য-গীত সম্ভোগে ক্ষতি কি?'

এই প্রস্তাবে লক্ষ্মণের সুচারু সুগৌর ললাটে লজ্জার রক্তাভা যে অপরূপ বর্ণচ্ছটার সৃষ্টি করল, তারাদেবী মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেদিকেই চেয়ে-ছিলেন। লক্ষ্মণ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নীরস কণ্ঠে বললেন, 'আপনার আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি আর্য রামচন্দ্রকে অচিরে নিবেদন করাই আমার যথার্থ বিশ্রাম দেবী। অন্য কোন চিত্তবিশ্রামে আমার রুচি নেই।'

তারাদেবী অনেকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন।